জুমুআর বয়ান

১ম খণ্ড

মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
আশিক ইকবাল (শিক্ষক)
মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহুল্লাহ

জুমুআর বয়ান

(১ম খণ্ড)

মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

JUMUYAR BAYAN

-by Muhammad Nasiruddin Chandpuri

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া

মুদ্রণঃ রজব ১৪৪৩, ফেব্রুয়ারী ২০২২

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহুল্লাহ
মাষ্টার আশিক ইকবাল

কম্পোজিংঃ হাফিয খালিদ সাইফুল্লাহ

হাদিয়াঃ ১৫০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মসজিদের ইমামদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, অধিকাংশ মসজিদের মুসল্লীরা ইমামদের যথাযথ কদর করেন না। এটা মুসলিম সমাজের একটি বড় দুর্বলতা। এদিকে বেশিরভাগ ইমামগণও জ্ঞান-স্বল্পতা, গাফিলতি, পরিস্থিতির প্রতিকূলতা প্রভৃতি কারণে নিজেদের দায়িত্ব সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারেন না।

জুমুআর দিন খুতবার আগে বাংলায় বয়ান করার নিয়ম বাঙালীদের প্রায় সব মসজিদে আছে। কিন্তু অধিকাংশ খতীবদের বয়ানে সমাজ কুরআন ও সুন্নাহর তেমন কিছু নসীহত পায় না। আবার কখনও জাল হাদীস, মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনি ও আবেগতাড়িত কথাবার্তা বলে দায় সারা হয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ খতীবদের সাপ্তাহিক দিক নির্দেশনা থেকে শুধু মাহরুম থাকে তাই নয়, বরং তারা বহু ভুল বার্তা শুনে গোমরাহ হন।

বোঝা গেল, সুস্থ সমাজ গঠনে খতীবদের জুমুআর বয়ানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমাদের জামিয়া নু'মানিয়ার মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ থেকে জুমুআর বয়ান প্রকাশের মেহনতটি চলছে।

'জুমুআর বয়ান' কিতাবের ১ম খণ্ড আপনার হাতে তুলে দিলাম। এতে যুল কা'দাহ মাসের প্রথম জুমুআ থেকে জুমাদাল উলা মাসের প্রথম জুমুআ পর্যন্ত (ঈদুল আযহার বয়ান সহ) মোট ২৭টি বয়ান রয়েছে। আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

বিনীত,

মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

নির্দেশনা

এ কিতাব থেকে বয়ান-বক্তৃতা করার সময় মনে রাখবেনঃ

(১) আমাদের বয়ানটি কোন্ মাসে ও কোন্ জুমুআর জন্য লেখা, তা খেয়াল রাখুন।

(২) বয়ানের বিষয়বস্তু অবশ্যই লক্ষ্য করুন।

(৩) বয়ানের মধ্যে আমরা যদি কোন কথা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলে থাকি আর সেটা যদি আপনার পরিবেশের জন্য সামাঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে আপনি সেটাকে বর্জন করুন।

(৪) আপনি বয়ান হুবহু মুখস্থ করে কিংবা বয়ানের সারমর্ম নিজের ভাষায় বলতে পারেন।

(৫) সাধারণত, বয়ানের তথ্যগুলি হাওয়ালা সহ লেখা আছে। আপনি হাওয়ালাগুলি বাদ দিয়েও বলতে পারেন। তাতে আপনার জন্য সহজ হবে। কিন্তু বর্তমান মানুষেরা উদ্ধৃতি নির্ভরকথা শুনতে পছন্দ করেন।

(৬) আপনি আমাদের বয়ানের আলোকে নিজের পরিবেশ অনুযায়ী নিজের মতো সাজিয়ে বয়ান তৈরী করে উপস্থাপন করতে পারেন।

বইটিতে যা আছেঃ

এ কিতাবে বিশেষ করে খতীবদের জন্য নিম্নলিখিত ২৭টি বিষয়ে বয়ান রয়েছেঃ

(১) যুল কা'দাহর ফযীলত, (২) হজ্জ, (৩) কুরবানী ও জরুরী মাসাইল, (৪) যুল হিজ্জা'র প্রথম দশক ও কুরবানী, (৫) তাকবীরে তাশরীক ও ঈদুল আযহার আমল, (৬) ঈদুল আযহা, (৭) তাকওয়া ও পরহেযগারী, (৮) গোনাহ ও তার ভয়াবহতা, (৯) নবীজির সমাজসেবা, (১০) হিজরী সালের সূচনা ও মুহার্‌রমের ফযীলত, (১১) কারবালার ঘটনার শিক্ষনীয় বিষয়, (১২) শয়তান ও তার চক্রান্ত, (১৩) আল্লাহর ৫টি বিশেষ নিয়ামত, (১৪) মানুষ কেন আশরাফুল মাখলূকাত, (১৫) ইল্‌মের গুরুত্ব, (১৬) হাদীসে জিবরাঈল, (১৭) হালাল-হারাম, (১৮) অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, (১৯) বিশ্বনবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, (২০) নবীজির নবী হওয়ার ৪টি দলীল, (২১) উম্মতের উপর নবীজির ৫টি হক, (২২) হাশর মাঠের ৫টি প্রশ্ন, (২৩) হুকূকুল্লাহ ও হুকূকুল ইবাদ, (২৪) ইখলাসের গুরুত্ব, (২৫) ৬টি আমল ও তার ফযীলত, (২৬) নামায, (২৭) সূরা আস্‌রের তাফসীর।

সূচিপত্র

বয়ান নম্বর ১

যুল কা'দাহ মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **যুল কা'দাহর ফযীলত**
পৃষ্ঠা নম্বর ১২

বয়ান নম্বর ২

যুল কা'দাহ মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **হজ্জ**
পৃষ্ঠা নম্বর ১৬

বয়ান নম্বর ৩

যুল কা'দাহ মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **কুরবানী ও জরুরী মাসাইল**
পৃষ্ঠা নম্বর ২৩

বয়ান নম্বর ৪

যুল কা'দাহ মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **যুল হিজ্জা'র প্রথম দশক ও কুরবানী**
পৃষ্ঠা নম্বর ২৯

বয়ান নম্বর ৫

যুল হিজ্জা'র প্রথম জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **তাকবীরে তাশরীক ও ঈদুল আযহার আমল**
পৃষ্ঠা নম্বর ৩৪

সূচিপত্র

বয়ান নম্বর ৬

১০ম যুল হিজ্জাহ ১৪৪২ হিজরী, ২১ জুলাই ২০২১
বিষয়বস্তুঃ **ঈদুল আযহা**

পৃষ্ঠা নম্বর ৩৯

বয়ান নম্বর ৭

যুল হিজ্জা'র দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **তাকওয়া ও পরহেযগারী**

পৃষ্ঠা নম্বর ৪৫

বয়ান নম্বর ৮

যুল হিজ্জা'র তৃতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **গোনাহ ও তার ভয়াবহতা**

পৃষ্ঠা নম্বর ৫১

বয়ান নম্বর ৯

যুল হিজ্জা'র চতুর্থ জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **নবীজির সমাজসেবা**

পৃষ্ঠা নম্বর ৫৬

বয়ান নম্বর ১০

মুহার্‌রমের প্রথম জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **হিজরী সালের সূচনা ও মুহার্‌রমের ফযীলত**

পৃষ্ঠা নম্বর ৬১

সূচিপত্র

বয়ান নম্বর ১১

মুহার্‌রমের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

বিষয়বস্তুঃ **কারবালার ঘটনার শিক্ষনীয় বিষয়**

পৃষ্ঠা নম্বর ৬৭

বয়ান নম্বর ১২

মুহার্‌রমের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

বিষয়বস্তুঃ **শয়তান ও তার চক্রান্ত**

পৃষ্ঠা নম্বর ৭২

বয়ান নম্বর ১৩

মুহার্‌রমের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

বিষয়বস্তুঃ **আল্লাহর ৫টি বিশেষ নিয়ামত**

পৃষ্ঠা নম্বর ৭৯

বয়ান নম্বর ১৪

সফর মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

বিষয়বস্তুঃ **মানুষ কেন আশরাফুল মাখলূকাত**

পৃষ্ঠা নম্বর ৮৫

বয়ান নম্বর ১৫

সফর মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

বিষয়বস্তুঃ **ইল্‌মের গুরুত্ব**

পৃষ্ঠা নম্বর ৯২

সূচিপত্র

বয়ান নম্বর ১৬

সফর মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **হাদীসে জিবরাঈল**
পৃষ্ঠা নম্বর ৯৯

বয়ান নম্বর ১৭

সফর মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **হালাল-হারাম**
পৃষ্ঠা নম্বর ১০৭

বয়ান নম্বর ১৮

রবীউল আওয়ালের প্রথম জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা**
পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪

বয়ান নম্বর ১৯

রবীউল আওয়ালের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **বিশ্বনবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী**
পৃষ্ঠা নম্বর ১২১

বয়ান নম্বর ২০

রবীউল আওয়ালের তৃতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **নবীজির নবী হওয়ার ৪টি দলীল**
পৃষ্ঠা নম্বর ১২৮

সূচিপত্র

বয়ান নম্বর ২১

রবীউল আওয়ালের চতুর্থ জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **উম্মতের উপর নবীজির ৫টি হক**
পৃষ্ঠা নম্বর ১৩৭

বয়ান নম্বর ২২

রবীউল আওয়ালের পঞ্চম জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **হাশর মাঠের ৫টি প্রশ্ন**
পৃষ্ঠা নম্বর ১৪৩

বয়ান নম্বর ২৩

রবীউস সানীর প্রথম জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **হুকূকুল্লাহ ও হুকূকুল ইবাদ**
পৃষ্ঠা নম্বর ১৫০

বয়ান নম্বর ২৪

রবীউস সানীর দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **ইখলাসের গুরুত্ব**
পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৮

বয়ান নম্বর ২৫

রবীউস সানীর তৃতীয় জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **৬টি আমল ও তার ফযীলত**
পৃষ্ঠা নম্বর ১৬৫

সূচিপত্র

বয়ান নম্বর ২৬

রবীউস সানীর চতুর্থ জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **নামায**

পৃষ্ঠা নম্বর ১৭২

বয়ান নম্বর ২৭

জুমাদাল উলার প্রথম জুমুআর বয়ান
বিষয়বস্তুঃ **সূরা আস্‌রের তাফসীর**

পৃষ্ঠা নম্বর ১৭৮

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ১

যুল কা'দাহ মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

৬ যুল কা'দাহ ১৪৪২ হিজরী, ১৮ জুন ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

মুহাদ্দিস কালিকাপুর মাদরাসা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভাই ও বন্ধুগণ ! সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য প্রশংসা জ্ঞাপন করি, যিনি আমাদেরকে সব রকম বালা-মুসিবত থেকে হিফাযত করে বর্তমান মহামারীর পরিস্থিতিতেও পবিত্র জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আসার তাওফীক দান করেছেন। সকলে বলি, আলহামদু লিল্লাহ ।

মুহতারম ভাই সকল ! আজ আরবী বারো মাসের মধ্য হতে "যুল কা'দাহ" মাসের প্রথম জুমুআ। এটা আরবী **১১**তম মাস। ইবাদত ও আমলের জন্য

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমাসের দু'রকম ফযীলত আছেঃ (১) যুল কা'দাহ মাস "আশহুরে হুরুম"-এর একটি মাস। অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট চারটি বিশেষ সম্মানীত মাসের একটি হল যুল কা'দাহ মাস। (২) এটা হজ্জের মাস সমূহের একটি মাস ।

মুসল্লী ভাই সকল ! আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমের সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"নিশ্চয় লাওহে মাহফূযে আল্লাহর নিকট (বছরে) মাসের সংখ্যা বারো। আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর এ বিধান চলছে। বারোটি মাসের মধ্য হতে চারটি মাস মহাসম্মানীত"। এটা সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতের তরজমা।

সহীহ বুখারীর ৩১৯৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, সেই সম্মানীত চারটি মাস হল – যুল কা'দাহ, যুল হিজ্জাহ, মুহার্‌রম ও রজব। এই চারটি মাসকে "আশহুরে হুরুম" বলা হয়। অর্থাৎ, মহাসম্মানীত চারটি মাস।

ঈমানদার ভাই সকল !

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনের চতুর্থ খণ্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে -- আদিপিতা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবীর যামানায় বারো মাসে এক বছর গণনা করার নিয়ম চলে আসছে। এর মধ্যে বিশেষ করে যুল কা'দাহ, যুল হিজ্জাহ, মুহার্‌রম ও রজব - এই চারটি মাসকে তখন থেকেই বড় বরকতময় ও সম্মানীয় মাস মনে করা হয়ে থাকে ।

সকল নবীর শরীয়ত এবিষয়ে একমত যে, এই চারটি মাসে যে কোন ইবাদাতের সাওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে, এই চারটি মাসে যে কোন পাপ করলে তার পরিণাম ও ভয়াবহতা অন্য মাসের তুলনায় অনেক বেশি। যুল কা'দাহ মাস এই চারটি মাসের একটি । অতএব, এ মাসে বেশি বেশি ইবাদত করতে হবে আর সব রকম গোনাহর কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে ।

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী ! আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুভাগমনের পূর্বে জাহেলি যুগের বর্বরতা ও হিংস্রতার ইতিহাস শুনেছি । তারা এতটা নির্দয় ও নিষ্ঠুর ছিল যে, নিজের জীবিত কন্যাসন্তানকে মরুভূমির তপ্ত মাটিতে জ্যান্ত

পুঁতে দিত। কথায় কথায় যে কোন তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত।

আল্লামা ইবনে কুতাইবাহ 'আল মাআরিফ' কিতাবে ১৩৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন – জাহেলি যুগে একটি উটের, ফসল-ক্ষেতে প্রবেশ করাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দুই গোত্রের মাঝে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছিল। যার ঐতিহাসিক নাম " বাসূস যুদ্ধ।" মনে রাখা দরকার, জাহেলি যুগে আরবরা এতটা নিষ্ঠুর ও যুদ্ধবাজ হওয়া সত্ত্বেও এই চারটি মাসের অত্যন্ত সম্মান করত ।

তাফসীরে ইবনে কাসীর চতুর্থ খণ্ডে ১৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে-- জাহেলি যুগে আরবের মানুষেরা সম্মানীত চারটি মাসের এতটা সম্মান করত যে, যদি কোন ব্যক্তির সামনে তার পিতার হত্যাকারী মহা আসামীও এসে যেত, তবুও তারা তাকে কোন রকম ভর্ৎসনা পর্যন্ত করত না এবং তার দিকে চোখ তুলেও তাকাতো না। আয়্যামে জাহিলিয়াতে মানুষের মনে এই চারটি মাসের কতটা কদর ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও এই চারটি মাসে বেশি বেশি সৎকাজ করা ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন।

সম্মানীয় ঈমানদার ভাই সকল ! আজ যুল কা'দাহ মাসের প্রথম জুমুআ। পবিত্র যুল কা'দাহ মাস যেমন "আশহুরে হুরুম"-এর মধ্যে একটি মাস, তেমনি এটি "আশহুরে হজ্জ"-এর একটি মাস। হজ্জের মাস সমূহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদের সূরা বাকারার ১৯৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ

অর্থাৎ, হজ্জ পালনের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে। সহীহ বুখারীর হজ্জ অধ্যায়ের ৩৩ নম্বর পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ) লিখেছেন--সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) বলেছেনঃ হজ্জের মাসগুলো হল শাওয়াল, যুল কা'দাহ ও যুল হিজ্জাহ

মাসের প্রথম ১০ দিন। অর্থাৎ, হজ্জের আমল যুল হিজ্জাহ মাসের আট তারিখ থেকে শুরু হলেও হজ্জের জন্য শাওআল ও যুল কা'দাহ মাসের যে কোন সময় ইহরাম বাঁধা যায় । শাওআল মাসের আগে হজ্জের ইহরাম বাঁধা জাইয নেই ।

আমরা জানি, ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে পঞ্চম বুনিয়াদ হজ্জ । যদি কোন মানুষের হজ্জ পালনের ক্ষমতা থাকে, তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়। আমরা অনেকে মনে করি, বার্ধক্য না আসলে হজ্জ করা ঠিক নয়। মনে রাখবেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এরূপ ধারণা পোষণ করে হজ্জ করায় বিলম্ব করা আদৌ ঠিক নয়।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রযি) বলেছেনঃ যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সে যদি হজ্জ না করে মারা যায়, তাহলে সেটা হবে ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানদের মতো মৃত্যুবরণ । আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হিফাযত করুন ।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! বর্তমান করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ব প্রায় অচল। এখন হজ্জ ও উমরার সফর করাও বন্ধ । এটা আল্লাহর গযব ছাড়া কিছুই নয় । আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সামর্থ্য ও সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করায় অবহেলা করেছি । ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য হজ্জের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন । আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন ।

পরিশেষে, হজ্জের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীস মনে রাখি। সহীহ বুখারীর ১৫২১ নম্বর হাদীস। আবূ হুরাইরাহ (রযি) বলেছেনঃ আমি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করবে এবং অশালীন কথাবার্তা ও গোনাহ থেকে বিরত থাকবে, সে মায়ের

পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ করে ফিরে আসবে ।

আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে জীবনে বারবার হজ্জ ও উমরাহ করার তাওফীক দান করুন । অনুরূপভাবে, পবিত্র যুল কা'দাহ মাসে বেশি বেশি নেক আমল করার ও সমস্ত রকম গোনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন ! আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ২

যুল কা'দাহ মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

১৩ যুল কা'দাহ ১৪৪২ হিজরী, ২৫ জুন ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

শাইখুল হাদীস, জামিয়া জামপুর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى؛ وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

উপস্থিত ঈমানদার মুসল্লী ভায়েরা !

আজ যুল কা'দাহ মাসের ১৩ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, তাই আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। সকলে বলি, আলহামদু লিল্লাহ।

মুসল্লী ভাইসকল ! মিশকাত শরীফের ৪ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের তরজমাঃ পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিতঃ (১) এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত দেওয়া, (৪) হজ্জ করা, (৫) রমাযান মাসে রোযা রাখা। এটা "মুত্তাফাক আলাইহি" হাদীস। অর্থাৎ, এ হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয় মুহাদ্দিস হযরত ইবনে উমার (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন ।

ঈমানদার ভায়েরা ! এ হাদীসে ইসলাম ধর্মকে পাঁচটি খুঁটি বিশিষ্ট একটি ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। খুঁটি ব্যতীত যেমন ঘর হয় না, তেমনি এ পাঁচটি জিনিসের কোন একটি বাদ দিয়েও ইসলাম হয় না। শুধুমাত্র ঘরের খুঁটিকে যেমন ঘর বলা যায় না, তেমনি কেবল এ পাঁচটি বিষয়কেই ইসলাম বলা যায় না। এ পাঁচটি জিনিস ছাড়াও ইসলামে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল রয়েছে। খুঁটি হল ঘরের বুনিয়াদ। অনুরূপ ভাবে, এ পাঁচটি জিনিস হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদি জিনিস। ঈমান আনার পর মু'মিন বান্দার প্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব কী, এ হাদীসে সে কথাই বলা হয়েছে।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! আল্লাহ আমাদেরকে বিনা আবেদনে ঈমানের সম্পদ দান করেছেন। এটা তাঁর মস্তবড় দয়া। এবার আমাদের কর্তব্য, চারটি আমলের মাধ্যমে তাঁর দাসত্ব প্রকাশ করা। (১) পাঞ্জগানা নামায কায়েম করে দিনে পাঁচবার আল্লাহর শাহী দরবারে হাজিরা দেওয়া । (২) মালদার

হলে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিয়ে আল্লাহর জন্য মাল ব্যয় করা । (৩) রমাযান মাসে রোযা পালন করে আল্লাহকে পাওয়ার সাধনা করা । (৪) সামর্থ্য থাকলে জান-মাল ব্যয় করে হজ্জ করা ।

দ্বীনদার ভাইসকল ! আজ বিশেষ করে হজ্জ সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করছি। কেননা, এটা যুল কা'দাহ মাস চলছে। হজ্জের মাস। আমি শুরুতে আপনাদের সম্মুখে সূরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াত পাঠ করেছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً "আর আল্লাহর জন্য মানুষদের উপর বাইতুল্লাহর হজ্জ করা ফরয, যারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছনোর সামর্থ্য রাখে।" এটা সূরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতের তরজমা। সর্বপ্রথম আমরা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করি। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হজ্জের নির্দেশ দেওয়ার আগে আয়াতের শুরুতে বলেছে وَ لِلّٰهِ - যার মানে, আর আল্লাহর জন্য। অর্থাৎ, হজ্জ করতে হবে আল্লাহর জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। এদ্বারা আল্লাহ তায়ালা বিশেষ করে হজ্জ করার ক্ষেত্রে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত শিক্ষা দিয়েছেন । যেন এমন না হয় যে, হাজী হওয়ার জন্য কিংবা ট্যুর করে ইনজয় করার উদ্দেশ্যে আমরা কেউ বাইতুল্লাহর সফর না করি। হজ্জের ক্ষেত্রে বে-ইখলাসির সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালা বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নিয়তে হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন ।

মনে রাখা দরকার, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে একবার হজ্জ করেছিলেন। তাঁর সেই হজ্জকে "বিদায়ী হজ্জ" বলা হয়। সহীহ বুখারীর ৪১৪৮ নম্বর হাদীসে সাহাবী আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে চারবার উমরাহ করেছেন। তার

মধ্যে একটা উমরাহ করেছিলেন বিদায়ী হজ্জের সাথে, যুল হিজ্জাহ মাসে। বাদবাকি তিনটি উমরাহ করেছিলেন যুল কা'দাহ মাসে। আজ সেই যুল কা'দাহ মাসের দ্বিতীয় জুমুআ।

নামাযী-মুসল্লী ভায়েরা ! সূরা আল ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হজ্জের নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ, হজ্জ সামর্থ্যবানদের উপর ফরয। এখানে সামর্থ্যের অর্থ হল, সাংসারিক খরচ-খরচা মেটানোর পর বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াত করার এবং বাড়ি ফেরা পর্যন্ত পরিবার বর্গের ভরণ-পোষণের ক্ষমতা থাকা। এও মনে রাখা দরকার, মহিলাদের জন্য যেহেতু স্বামী কিংবা কোন মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়তে নিষিদ্ধ, তাই মহিলাদের ক্ষেত্রে সাথে স্বামী অথবা কোন মাহরাম পুরুষ থাকাটাও শর্ত। মহিলাদের মাহরাম মানে, এমন পুরুষ যার সাথে কখনো বিয়ে করা যায় না। যেমন ছেলে, বাপ, দাদা, চাচা, মামু প্রভৃতি।

আমরা এ মাসআলাটি খুব ভালো ভাবে জেনে নিই। যদি কোন মহিলা কোটিপতিও হয় কিন্তু তার সাথে যাওয়ার মতো কোন মাহরাম পুরুষ কিংবা স্বামী না থাকে, তাহলে তার উপর হজ্জ আদায় করা ফরয হবে না। কখনো দেখা যায়, মহিলারা দূর সম্পর্কের কোন গায়ের মাহরাম ব্যক্তিকে নিজের মাহরাম অভিভাবক সাজিয়ে হজ্জ করতে যায়। এটা সম্পূর্ণ হারাম কাজ। এভাবে হজ্জ করলে সাওয়াব তো দূরের কথা, গোনাহ ছাড়া আর কিছুই মিলবে না।

শ্রোতামণ্ডলী ! হজ্জ ও উমরাহ করলে মালে বরকত হয় এবং অভাব দূর হয়ে যায়। এটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। তিনি হজ্জের ফযীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেনঃ তোমরা হজ্জের পর উমরাহ এবং উমরাহ্‌র পর হজ্জ কর। অর্থাৎ, তোমরা বারংবার হজ্জ ও উমরাহ কর। কেননা,

হজ্জ ও উমরাহ, অভাব-অনটন ও গোনাহ দূর করে দেয়। যেমনভাবে, হাপরের আগুন লোহা ও সোনা-রুপোর ময়লা দূর করে দেয়। হাদীসের শেষে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেনঃ মকবূল হজ্জের সাওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটা সুনানে তিরমিযীর ৮১০ নম্বর হাদীস। ইমাম তিরমিযী (রহ) লিখেছেন, এটা সহীহ হাদীস। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হজ্জ ও উমরাহ করার তাওফীক দান করুন।

মুসল্লী ভায়েরা ! হজ্জ এমন একটি ইবাদত, যা পবিত্র কাবাঘরকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। তাই আজ কাবাঘর সম্পর্কে দু'চার কথা বলে রাখি। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৬ খণ্ডের ২৫৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, কাবাঘর নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আগে থেকে মৌজুদ ছিল। হযরত আদম আলাইহি সালামের যামানাতেও কাবাঘর ছিল। আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরবর্তী নবীগণ কাবাঘর তাওয়াফ করেছেন। নবী নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর কাবাঘরের বুনিয়াদ নির্দিষ্ট জায়গায় অবশিষ্ট ছিল। অবশেষে, নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেটাকে পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন। কাবাঘর তৈরি হয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মানুষদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দিতে বলেছিলেন। তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ ! এখানে তো কোন মানুষ বসবাস করে না। আমার আওয়াজ শোনার মতো কেউ তো এখানে নেই। বহু দূরে যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ পৌঁছবে কীভাবে ? আল্লাহ তায়ালা উত্তরে বলেছিলেনঃ তোমার দায়িত্ব ঘোষণা করা, পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব। তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম "মাকামে ইবরাহীমে" দাঁড়িয়ে, (কোন কোন বর্ণনা মতে কাবাঘরের নিকটস্ত আবূ কুবায়েস নামক পাহাড়ে

দাঁড়িয়ে) মানুষদেরকে হজ্জের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা মু'জিযা স্বরূপ নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওয়াজ বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন। শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে, তাদের সকলের কানে এ আওয়াজ পৌঁছে যায়। যাদের ভাগ্যে হজ্জ লেখা ছিল, তারা এ আওয়াজ শুনে বলেছিলঃ "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।" হযরত ইবনে আব্বাস (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেনঃ হাজীগণ হজ্জের সময় লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে যে দুআটি পড়ে থাকেন, সেটা আসলে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সেই আহ্বানের জওয়াব। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে এসব কথা লেখা আছে।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! আল্লাহ তায়ালা সূরা হজ্জের ২৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ " আর মানুষেরা যেন স্বাধীন ঘরের তাওয়াফ করে।" এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কাবাঘরকে "স্বাধীন ঘর" বলেছেন। স্বাধীন ঘর মানে, কাবাঘরকে আল্লাহ স্বেচ্ছাচারী জালেমদের হাত থেকে আজাদ ও সংরক্ষিত করেছেন। সুনানে তিরমিযীর ৩১৭০ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কাবাঘরকে "স্বাধীন ঘর" এজন্য বলা হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন স্বেচ্ছাচারী জালেম কখনও এর উপর কর্তৃত্ব প্রসার করতে পারিনি। ইমাম তিরমিযী (রহ) হাদীসটি বর্ণনা করে লিখেছেন, এটা হাসান পর্যায়ের বিশুদ্ধ হাদীস।

ঈমানদার ভায়েরা ! ইতিহাস সাক্ষী, কাবা শরীফ সর্বকালে স্বেচ্ছাচারী জালেমদের হাত থেকে সংরক্ষিত থেকেছে। যদি কখনো কোন জালেম, কাবাঘরের ক্ষতি করতে চেয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে নাস্তানাবুদ করে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

আমরা এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবরাহা বাদশার ঘটনা স্মরণ করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে সূরা ফীলের মধ্যে আবরাহা বাদশার কাবাঘর আক্রমণের চেষ্টা ও তার ভয়াবহ শাস্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

তবে এও মনে রাখা দরকার যে, কিয়ামতের প্রাক্কালে কাবাঘর ধ্বংস হবে। আর তারপর দুনিয়া খুব বেশি দিন চলবে না। সহীহ বুখারীর ১৫৯১ ও ১৫৯৬ নম্বর হাদীসে আবূ হুরায়রাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

"ছোট ছোট পা ওয়ালা হাবাশার এক ব্যক্তি কাবাঘর ধ্বংস করবে।.।" পরিশেষে, আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে পবিত্র কাবাঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ করার তাওফীক দান করুন ! رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ৩

কুরবানী ও জরুরী মাসাইল

যুল কা'দাহ মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২০ যুল কা'দাহ ১৪৪২ হিজরী, ২ জুলাই ২০২১)

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ❁ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ❁ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানীয় দ্বীনদার নামাযী ভাই সকল ! আজ যুল কা'দাহ মাসের ২০ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। পবিত্র ঈদুল আযহার আর মাত্র ২০ দিন বাকি আছে। তাই আজ আমরা কুরবানী ও কিছু জরুরী মাসাইল সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমে কুরআন মাজীদের সূরা কাওসারের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর দ্বারা আলোচনা শুরু করছি। কেননা, এ সূরার মধ্যে রয়েছে ঈদের নামায ও কুরবানীর নির্দেশ । আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ❁ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ❁ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

তরজমাঃ "নিশ্চয় আমি আপনাকে 'কাওসার' দান করেছি। সুতরাং আপনি নিজের রবের জন্য (ঈদের) নামায পড়ুন ও কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার শত্রুই নির্বংশ।" এ পর্যন্ত সূরা কাওসারের তরজমা শেষ হল ।

এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর ইবনে কাসীরের ৮ খণ্ডের ৫০৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,

মক্কায় থাকাকালীন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র 'কাসিম' ইন্তেকাল করেছিলেন। তখন আবূ জাহ্‌ল, আবু লাহাব ও মক্কার কিছু কাফির নেতা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলেছিলঃ মুহাম্মাদ তো নির্বংশ। ওর কোনো পুত্র সন্তান নেই। মৃত্যুর পর ওর ধর্ম তো দূরের কথা, নাম নেওয়ার কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার প্রিয় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এ সূরাটি নাযিল করেছিলেন।

সূরাটির শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেনঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ "নিশ্চয় আপনার শত্রুই হবে নির্বংশ।" সত্যিই আজ আমরা দেখছি, আবূ জাহ্‌ল ও আবূ লাহাবের ন্যায় নবীর দুশমনরা নির্বংশ। পৃথিবীর কোথাও তাদের কোন বংশধরের অস্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে, আমার নবীজির বংশধর এখনো আছে এবং ইনশা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর বর্তমান পৃথিবীতে আবূ জাহ্‌ল আবূ লাহাবের, প্রশংসার নজরে নাম নেওয়ার মতো কেউই নেই। পক্ষান্তরে, কলিমা, আযান, ইকামত ও নামায প্রভৃতির মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় নবীজির পবিত্র নাম সবসময় উচ্চারণ হচ্ছে। এটা সূরা কাওসারের তৃতীয় আয়াতের বাস্তবতা।

শ্রোতামণ্ডলী ! সূরা কাওসারের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ " হে নবী ! নিশ্চয় আমি আপনাকে 'কাওসার' দান করেছি।"

তাফসীরে তবারীর ২৪ খণ্ডের ৬৭৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আনাস রযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যামতে, কাওসার মানে হাশর-মাঠের 'হাউজে কাওসার'। যা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেওয়া হবে। যে হাউজ থেকে তিনি নিজের উম্মতকে পানি পান করাবেন । আর এটাই 'কাওসার' কথাটির সবচেয়ে মাশহূর ব্যাখ্যা ।

সহীহ বুখারীর ৬৫৮৩ নম্বর হাদীসে সাহাবী সাহ্‌ল বিন সা'দ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হাউজে কাওসারের পানি পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না । আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাত থেকে হাউজে কাওসারের পানি পান করার সৌভাগ্য দান করুন ।

ঈমানদার ভাই সকল ! সূরা কাওসারের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ অতএব, হে নবী আপনি নিজের রবের জন্য (ঈদের) নামায পড়ুন ও কুরবানী করুন। এই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নামায ও কুরবানীর আদেশ দিয়েছেন। নামায হল দৈহিক ইবাদত আর কুরবানী একটি আর্থিক ইবাদত। এ ইবাদত দু'টির মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা সূরা আনআমের ১৬২ নম্বর আয়াতে এ ইবাদত দুটিকে একত্রিত ভাবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তরজমাঃ "হে নবী ! আপনি বলুনঃ নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী ও আমার জীবন-মরণ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য।"

শ্রোতামণ্ডলী ! কুরবানীর ঈদের আর মাত্র ২০ দিন বাকি আছে। মনে রাখা দরকার, পশু কুরবানী করা কেবল আমাদের উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বৈশিষ্ট্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী করার নিয়ম, নবী আদম আলাইহিস সালামের যামানা থেকে চলে আসছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা হজ্জের ৩৪ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি।"

তাফসীর ইবনে কাসীরের ৮ খণ্ডের ৫০৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,মক্কার মুশরিকরা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম

অনুসরণের দাবিদার ছিল। তাই তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পশু কুরবানী করার আমল অনুসরণ করে, প্রতি বছর কুরবানী দিত । তবে তারা আল্লাহর নামে নয় বরং নিজেদের দেব-দেবীর নামে কুরবানী করত । অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে পশু জবাই করা শির্ক। আর এরূপ পশুর গোশত খাওয়াটাও হারাম। এ বিষয়ে কুরআন কারীমের সূরা মাইদার ৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرُ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

তরজমাঃ "তোমাদের উপর মৃতপ্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোশত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে জবাই করা প্রাণীর গোশত হারাম করা হয়েছে।"

সম্মানীত শ্রোতামণ্ডলী ! বর্তমান যুগে কেউ কেউ প্রচার করছেন যে, কুরবানী করা একটি ফযীলতের বিষয় । এটা কোন ওয়াজিব আমল নয় । তারা বলছেনঃ যদি কোন কোটিপতি মানুষও কুরবানী না করে, তাহলে নাকি কোন রকম গোনাহ হবে না । মনে রাখবেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা । সঠিক কথা হল, কুরবানী করা ওয়াজিব । কেননা, সূরা কাওসারের ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন । আর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের মাদানী জীবনে প্রত্যেক বছর পাবন্দি সহকারে কুরবানী করতেন । এ সম্পর্কে সুনানে তিরমিযীর ১৪৯৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) বলেছেনঃ

أَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ

"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে দীর্ঘ দশ বছর অবস্থান কালে প্রত্যেক বছর পশু কুরবানী করতেন।" ইমাম তিরমিযী (রহ) লিখেছেন, এ হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের সহীহ। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কুরবানী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

আমল। এ জন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই এটা বাদ দেন নি ।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার আর একটি বলিষ্ঠ দলীল এই যে, সুনানে ইবনে মাজার ২১২৩ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরা (রযি) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَنْ وَّجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

যে ব্যক্তি কুরবানী করায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদ ময়দানে না আসে । হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের সহীহ । এ হাদীস দ্বারা খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব । এ জন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী করায় অবহেলা কারী ব্যক্তিকে কঠোরভাবে ঈদগাহে আসতে নিষেধ করেছেন ।

এখন প্রশ্ন হল, সামর্থ্যবান কারা ? এ সম্পর্কে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহে লেখা আছে, যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখের ফজর থেকে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিস্ক-সম্পন্ন মুসলিম, পুরুষ কিংবা নারী নিসাব পরিমাণ অর্থের মালিক হয়, তাহলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হবে।

নিসাব পরিমাণ অর্থ বলতে (১) সোনা, (২) রুপো, (৩) টাকা-পয়সা, (৪) ব্যবসার মাল এই চারটি সম্পদ মিলিয়ে ঋণ বাদ দিয়ে সাড়ে ৫২ ভরি রুপোর মূল্য পরিমাণ অর্থ । তবে যদি, কারোর কাছে এই চারটি সম্পদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র সোনা থাকে, বাকি তিনটির কিছুই না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সাড়ে ৭ ভরি পরিমাণ সোনা, নিসাব বলে ধর্তব্য হবে ।

এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন । সেটা হল, সাড়ে ৫২ ভরি রুপো ও সাড়ে ৭ ভরি সোনা, কথাটি পুরাতন হিসাব অনুযায়ী। পুরাতন হিসাবে ভরি হত ১১ গ্রাম ৬৬৪ মিলিগ্রামে । আর এখন হয় ১০ গ্রামে।

সাড়ে ৫২ ভরি রুপোর ওজন ৬১২ গ্রামের সামান্য বেশি। অতএব, এখনকার (১০ গ্রামের) ভরি হিসাবে রুপোর নিসাব হবে ৬১ ভরি ২ গ্রাম ।

অনুরূপভাবে, সাড়ে ৭ ভরি সোনার ওজন প্রায় সাড়ে ৮৭ গ্রাম। অতএব, এখনকার ভরি হিসাবে সোনার নিসাব হবে ৮ ভরি সাড়ে ৭ গ্রাম । সারকথা, এখনকার ভরি হিসাবে যাকাত, ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য শরয়ী নিসাব হল ৬১ ভরি ২ গ্রাম রুপো, অথবা ৮ ভরি সাড়ে সাত গ্রাম সোনা। এও মনে রাখবেন, আজকাল রুপোর দাম হিসাবে রুপোর নিসাব-মূল্য হচ্ছে ৪৩ হাজার টাকা।

মুহতারম ভাই সকল ! কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি খুবই জরুরী মাসআলা জেনে রাখা দরকারঃ (১) কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা, ফ্লাট, দোকান, যান-বাহন, মেশিনপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাড়ির আসবাবপত্র, এক কথায় জীবন যাপনের নিত্য প্রয়োজনের জিনিস-পত্রের ধর্তব্য নেই। তবে এগুলি যদি ব্যবহার ও প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত হয় আর তার মূল্য রুপোর নিসাব পরিমাণ হয়,তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। (২) যদি পরিবার-বর্গের পূর্ণ এক বছরের খোরাকি উৎপাদনের জন্য যতটা চাষের জমি প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি জমি থাকে আর তার মূল্য যদি রুপোর নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হবে। সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আলমায়ী ২ খণ্ডের ৫৬৫ পৃষ্ঠায় এ মাসআলা দু'টি লেখা আছে ।

আমরা পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা গোটা মুসলিম বিশ্বের সকলকে বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পবিত্র ঈদুল আযহা ও কুরবানী আদায় করার তাওফীক দান করুন । وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বয়ান নম্বর ৪

যুল হিজ্জা'র প্রথম দশক ও কুরবানী

যুল কা'দাহ মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

২৭ যুল কা'দাহ ১৪৪২ হিজরী, ৯ জুলাই ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

শাইখুল হাদীস, জামিয়া জামপুর

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ وَالْفَجْرِ ❁ **وَلَيَالٍ عَشْرٍ ❁ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ❁ وَاللَّيْلِ اِذَايَسْرِ ❁ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ❁** صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত মুসল্লী ভায়েরা ! আজ যুল কা'দাহ মাসের ২৭ তারিখ, শেষ জুমুআ। আর মাত্র ২ / ৩ দিন পর যুল হিজ্জাহ মাস শুরু হতে চলেছে। তাই আজ আমরা (ইনশা আল্লাহ) যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশক ও কুরবানী সম্পর্কে আলোচনা করব।

কুরআন ও হাদীসে যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের বহু ফযীলত বর্ণিত আছে। কুরআন মাজীদে সূরা ফজ্‌রের ১ ও ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَالْفَجْرِ ❁ وَلَيَالٍ عَشْرٍ " ফজ্‌রের ওয়াক্তের কসম, এবং দশটি রাতের কসম"।

এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ফজরের সময়ের কসম খেয়েছেন। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে দশটি রাতের কসম খেয়েছেন। এই দশটি রাত কোন্‌টি ? এ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে তবারীতে লেখা আছে, ইবনে আব্বাস (রযিঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে দশটি রাতের কসম খেয়েছেন, সেগুলি হল, যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ

এখানে একটি মাসআলা বলে রাখি। প্রত্যেক সপ্তাহে বগল ও নাভির নীচের চুল ও নখ কাটা মুস্তাহাব। আর ৪০ দিনের মধ্যে কাটা সুন্নত। ৪০ দিনের বেশি দিন যাবত না কাটা মাকরূহ তাহরীমী। অতএব, যদি কোন কুরবানী দাতার অতিরিক্ত চুল ও নখ, যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকে ৪০ দিনের বেশি হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য এ দিনগুলিতে চুল ও নখ না কাটা মুস্তাহাব নয়। বরং এরূপ ব্যক্তি নিজের চুল ও নখ কেটে নেবে।

আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে আগামী যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকে এ আমলগুলি করার তাওফীক দান করুন।

সম্মানিত ভাই সকল ! যুল হিজ্জাহ মাসের বৈশিষ্ট্য হল, দ্বীন-ইসলামের পরিচয় বহনকারী বিশেষ দু'টি ইবাদত এ মাসে ছাড়া অন্য কোন মাসে হয় না। (১) হজ্জ, (২) কুরবানী। এ বছর আমরা হজ্জ করতে না পারলেও, (আলহামদু লিল্লাহ) কুরবানী করতে পারছি।

কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে সুনানে তিরমিযীর ১৪৯৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মানুষ কুরবানীর দিন আল্লাহর নিকট পশু কুরবানী করার চেয়ে পছন্দনীয় আমল আর কিছুই করতে পারে না। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশু শিং, পশম, এবং ক্ষুর সহ হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত যমীনে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব, তোমরা খুশি মনে কুরবানী কর"। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের বিশুদ্ধ।

সুনানে ইবনে মাজা'র ৩১২৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, এক সময় সাহাবারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল ! কুরবানীর পশু যবাই করার কারণ কী ? তিনি বলেছিলেনঃ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের

সুন্নত"। এখানে সুন্নত মানে, তরীকা। অর্থাৎ, কুরবানী করা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তরীকা। এর মানে এই নয় যে, সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। কেননা, সুনানে ইবনে মাজার ২১২৩ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

যে ব্যক্তি কুরবানী করায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদ-ময়দানে না আসে। হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের সহীহ । এ হাদীস দ্বারা খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। এ জন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী করায় অবহেলা কারী ব্যক্তিকে কঠোরভাবে ঈদগাহে আসতে নিষেধ করেছেন ।

যাইহোক, আমরা মূল কথায় ফিরে আসি। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "কুরবানী হল তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নত"। এখানে দু'টি কথা বিশেষ লক্ষনীয়। (১) এ হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের পিতা"। এর কারণ এই যে, মানুষ সাধারণত নিজের বাপ-দাদার প্রচলিত আমলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালোবাসে। তাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, কুরবানী যেহেতু তোমাদের পিতার সুন্নত, এটা বাইরের কোন জিনিষ নয়, তাই তোমরা এটাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে পালন কর।

(২) নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নত কী ছিল ? আমরা জানি, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুত্র সন্তান যবাই করার আদেশ পেয়ে সন্তান যবাই করার উদ্দেশ্যে ছুরি চালিয়েছিলেন। শেষমেশ, আল্লাহর নির্দেশে সন্তানের পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন। যেহেতু তাঁর নিয়ত ছিল সন্তান কুরবানী করা, তাই নিশ্চয় তিনি সন্তান কুরবানীর সওয়াব

পেয়েছেন। এবার আমাদের যখন বলা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের পিতার সুন্নত পালন কর, তখন আমরা যদি বিশুদ্ধ নিয়তে কুরবানী করি, তাহলে (ইনশা আল্লাহ) আমরাও সন্তান কুরবানীর সওয়াব পাব। শর্ত হল, পরিপূর্ণ ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে কুরবানী করতে হবে।

সুধীবৃন্দ ! কুরবানীতে প্রকৃতপক্ষে সন্তান যবাই করার পরিবর্তে পশু যবাই করা হয়। তাই কুরবানীর পশু মনের মতো পছন্দনীয় ও দোষমুক্ত হওয়া জরুরী।

সহীহ বুখারীর ২ খণ্ডের ৮৩৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, সাহাবী আবূ উমামাহ (রযিঃ) বলেছেনঃ আমরা মদীনায় কুরবানীর পশুকে মোটাতাজা করতাম। সুনানে তিরমিযীর ১৪৯৭ নম্বর হাদীসে বারা ইবনে আযিব (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (১) খোঁড়া পশু যার খোঁড়ামী স্পষ্ট, (২) অন্ধ পশু যার অন্ধ হওয়া সুস্পষ্ট, (৩) রোগাক্রান্ত পশু যার রোগ স্পষ্ট, (৪) রোগা পশু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে, (এ চার রকম পশু) কুরবানী করা যাবে না। ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেছেনঃ এটা সহীহ হাদীস।

ঈমানদার ভায়েরা ! এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি। একটা হল, কুরবানী জাইয হওয়া। আর একটা হল, কুরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া। এ দু'টি আলাদা আলাদা জিনিস।

কুরবানী জাইয হওয়ার শর্ত হল, পশুর পূর্ণবয়স্ক হওয়া। অর্থাৎ, ছাগল এক বছর, গরু দু'বছর ও উট পাঁচ বছরের হতে হবে। আর পশু দোষমুক্ত হতে হবে। দোষমুক্ত হওয়া বলতে, পশুর কোন অঙ্গের তিন ভাগের এক ভাগ যেন নষ্ট না হয়ে থাকে।

আর কুরবানী আল্লাহর কছে কবুল হওয়ার শর্ত হল, খাঁটি নিয়তে কেবল আল্লাহর জন্য পশু যবাই করা। গোস্ত খাওয়ার

জন্য কিংবা লোক দেখানোর জন্য কুরবানী করলে আল্লাহর কাছে সেটা কবুল হবে না। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে সূরা হজ্জের ৩৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

"আল্লাহর কাছে কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত যায় না। তাঁর কাছে যায় তোমাদের মনের তাকওয়া।" এ আয়াতে "মনের তাকওয়া" মানে হল, মনের ইখলাস, লিল্লাহিয়াত ও ভক্তি-ভালোবাসা। অতএব, আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে খাঁটি নিয়তে কুরবানী করার তাওফীক দান করুন। وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ৫

তাকবীরে তাশরীক ও ঈদুল আযহার আমল

যুল হিজ্জা'র প্রথম জুমুআর বয়ান

(৫ যুল হিজ্জাহ ১৪৪২ হিজরী, ১৬ জুলাই ২০২১)

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۞ اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ **وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ** ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা !

আজ যুল হিজ্জাহ মাসের ৫ তারিখ, প্রথম জুমুআ। পবিত্র ঈদুল আযহার আর মাত্র ৪ দিন বাকি আছে । আমরা

গত জুমুআয় এমাসের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত ও বিশেষ কিছু আমল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আজ আমরা এ মাসের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। (১) ঈদুল আযহা, (২) তাকবীরে তাশরীক ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে সূরা বাকারার ২০৩ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর সংখ্যায় গোনা কয়েকটি দিনে।" মুফাসসির সম্রাট সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) বলেছেনঃ এ আয়াতে "কয়েকটি দিন" বলতে তাকবীরে তাশরীক পড়ার দিনগুলিকে বোঝানো হয়েছে ।

অতএব, আমরা আজ তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে ৫ টি মাসআলা জেনে নেবঃ (১) তাকবীরে তাশরীক কাকে বলে ? (২) তাকবীরে তাশরীকের প্রেক্ষাপট কী ? (৩) তাকবীরে তাশরীক কোন্ দিনগুলিতে পড়তে হয় ? (৪) তাকবীরে তাশরীক পড়তে হয় কেন ? (৫) তাকবীরে তাশরীক কাদের উপর ওয়াজিব এবং কতবার পড়তে হয় ?

প্রথম মাসআলাঃ তাকবীরে তাশরীক কাকে বলে ? মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা নামক হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) তাকবীরে তাশরীক এভাবে পড়তেনঃ

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ– اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

এটাকে বলা হয় তাকবীরে তাশরীক।

দ্বিতীয় মাসআলাঃ তাকবীরে তাশরীকের প্রেক্ষাপট কী ? এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকারক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ) আল বিনায়াহ কিতাবে (তৃতীয় খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন নিজের পুত্র ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসমান থেকে দুম্বা নিয়ে

এসে পিতা ও পুত্রের কুরবানীর দৃশ্য দেখে বলেছিলেনঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তাঁর আওয়াজ শুনে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উত্তরে বলেছিলেনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার। অতঃপর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আসমানী দুম্বা দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলেছিলেনঃ আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ। এ হল তাকবীরে তাশরীকের প্রেক্ষাপট। মুহাদ্দিসগণের মতে এঘটনাটি সূত্রভিত্তিক না হলেও ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে এটি লেখা আছে।

তৃতীয় মাসআলাঃ তাকবীরে তাশরীক কোন্ দিনগুলিতে পড়তে হয় ? এ সম্পর্কে ফাতাওয়া শামী কিতাবে (তৃতীয় খণ্ডের ৬৪,৬৫ পৃষ্ঠায়) লেখা আছে, যুল হিজ্জাহ মাসের ৯ তারিখের ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত (মোট ৫ দিনে ২৩ ওয়াক্ত) ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। আর যুল হিজ্জাহ মাসের বাদবাকি শুরু দিনগুলিতে যেকোন সময় যেকোন স্থানে বেশি বেশি তাকবীর পড়া মুস্তাহাব ।

চতুর্থ মাসআলাঃ তাকবীরে তাশরীক পড়তে হয় কেন ? এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের বাদা-ইউস সানাইয় নামক কিতাবে (দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায়) লেখা আছে, আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলিতে তাকবীরে তাশরীক পড়া হয় হাজীগণের হজ্জের আমলের সম্মানার্থে। এর উদ্দেশ্য হল, হাজীদের সাদৃস্য ধারণ করা। হাজীরা যেমনভাবে "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" পড়তে পড়তে হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়, তেমন বিশ্বের সকল ঈমানদারগণ তাকবীরে তাশরীক পড়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।

পঞ্চম মাসআলাঃ তাকবীরে তাশরীক কাদের উপর পড়া ওয়াজিব এবং কত বার পড়তে হয় ? এ সম্পর্কে জানা দরকার যে, ফাতাওয়া আলমগীরি কিতাবে (প্রথম খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায়) লেখা আছে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী, শহর ও

গ্রামবাসী, মুসাফির ও মুকীম, একাকী নামায আদায়কারী ও জামাআতে নামায আদায়কারী, ইমাম ও মুক্তাদী সকলের উপর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। মোটকথা, যার উপর ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয, তার উপর প্রত্যেক ফরয নামাযের পর কমপক্ষে ১ বার তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। পুরুষেরা পড়বে উচ্চস্বরে আর মহিলারা পড়বে আস্তে ।

ফিকাহ শাস্ত্রের কোন কোন কিতাবে লেখা আছে, তাকবীরে তাশরীক ৩ বার পড়া সুন্নাতের খিলাপ। আল্লামা শামী (রহ) বলেছেনঃ এ কথাটি ঠিক নয়। সঠিক কথা হল, ১ বার পড়া ওয়াজিব আর ৩ বার পড়া ভালো। এটা আল্লামা শামীর মত। তিনি নিজের ফাতাওয়া শামী নামক কিতাবে (তৃতীয় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায়) এ কথা লিখেছেন। এ পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীকের আলোচনা শেষ হল।

সুধীবৃন্দ ! আসুন, এবার আমরা ঈদুল আযহা সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করি। মনে রাখবেন, ঈদুল আযহার দিনে করনীয় আমল হল ১৪ টি। আর বর্জনীয় কাজ হল ৪ টি ।

কুরআন ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈদুল আযহার দিনে এই ১৪ টি আমল করা উচিতঃ (১) ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা, (২) ফজরের সময় সত্বরে ঘুম থেকে ওঠা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) গোসল করা, (৫) উত্তম পোশাক পরিধান করা, (৬) শরীয়ত সম্মত সাজগোজ করা, (৭) আতর ব্যবহার করা, (৮) না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া, (৯) ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া, (১০) ঈদুল আযহার দিনে ময়দানে যাওয়ার সময় জোরে জোরে তাকবীরে তাশরীক পড়তে থাকা, (১১) ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া, অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা, (১২) পশু কুরবানী করার পর শরীরের অতিরিক্ত চুল ও নখ কাটা, (১৩) ঈদের নামাযের পর কুরবানীর গোশত

দ্বারা প্রথম আহার করা। (১৪) একে অপরকে দু'আ দেওয়া এবং হাদিয়া-তোহফা বিনিময় করা।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে এ সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলগুলির কথা লেখা আছে। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন ।

মুসল্লী ভায়েরা ! ৪ টি কাজ এমন আছে, যা ঈদের দিনে বিশেষভাবে বর্জনীয়ঃ (১) ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম । মনে রাখবেন, দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পর ৩ দিন, (বছরে মোট এই ৫ দিন) রোযা রাখা হারাম। (২) ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাযের পূর্বে কোন রকম নফল নামায পড়া মাকরূহ। (৩) ঈদের দিনে ঈদগাহ ও ঘর-বাড়ি সাজানোয় অতিরঞ্জন করা ঠিক নয়। (৪) দেখা যায়, ঈদের দিনে মহিলারা বেপর্দা হয়ে রাস্তা-ঘাটে ঘোরাফেরা করে। এটা হারাম।

পরিশেষে আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে শরীয়তের আলোকে জীবনযাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ৬

ঈদুল আযহা

১০ম যুল হিজ্জাহ ১৪৪২ হিজরী, ২১ জুলাই ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী সাইফুল ইসলাম কাসিমী

প্রধান মুফতী, জামপুর মাদরাসা

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ- اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ ❁ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ **اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ❁ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ❁ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ** ❁ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

ঈমানদার ভাই সকল ! আজ পবিত্র ঈদুল আযহার দিন। আজ আমাদের বিশেষ করে দু'টি আমল করতে হবে। একটি হল, ঈদের নামায আদায় করা। আর একটি হল, কুরবানী করা। ঈদুল আযহার দিনে এদু'টি আমল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা কাওসারের ২ নম্বর আয়াতে ঈদুল আযহার দিনে এ আমল দু'টি করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " হে নবী ! আপনি নিজের রবের জন্য নামায পড়ুন আর পশু যবাই করুন। বিশ্ববিখ্যাত কিতাব তাফসীরে জালালাইনে লেখা আছে, এ আয়াতে নামায বলতে বিশেষ করে ঈদুল আযহার নামাযের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সহীহ বুখারীর ৫৫৪৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ

"নিশ্চয় আমরা আমাদের এই ঈদুল আযহার দিনে সর্বপ্রথম নামায আদায় করব । তারপর ফিরে যেয়ে পশু যবাই করব।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আজ পবিত্র ঈদুল আযহার দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল, নামায পড়া। আর দ্বিতীয় কাজ হল, পশু কুরবানী করা।

সুধীবৃন্দ ! মনে রাখবেন, এ আমল দু'টির প্রত্যেকটির সূচনায় রয়েছে এক বিশেষ ইতিহাস। প্রথমে আমরা ঈদ সম্পর্কে আলোচনা করছি। দ্বীন-ইসলামে ঈদের সূচনা কীভাবে হয়েছিল, সে সম্পর্কে সুনানে আবূ দাউদের ১১৩৪ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছেঃ

عن أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

হযরত আনাস (রযি) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে দেখেন, মদীনার মানুষেরা নির্দিষ্ট দু'টি দিনে খেলাধূলা ও আনন্দোৎসব পালন করে থাকে। এটা দেখে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের এ দু'দিন উৎসবের কারণ কী ? মদীনা বাসীরা বলেছিলঃ জাহেলী যুগে আমরা এ দু'দিন খেলাধূলা করতাম, তাই এখনো করছি। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য এ দু'দিনের পরিবর্তে এরচেয়ে উত্তম দু'টি দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেনঃ (১) ঈদুল আযহা, (২) ঈদুল ফিতর।

শ্রোতামণ্ডলী ! সেই থেকে আজ ১৪ শ' বছর যাবত সারা দুনিয়ার উম্মতে মুসলিমা বছরে এই দু'টি ঈদের দিন পালন করে আসছে। এ হল দুই ঈদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ঈদ সম্পর্কে মনে রাখবেন, ঈদের দিনে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা সুন্নত। এদিন একে অপরকে দুআ দেওয়া এবং হাদিয়া-তোহফা বিনিময় করাও সুন্নত। সহীহ বুখারীর ৯৮৭ নম্বর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, ঈদের দিনে খেলাধূলা করারও অবকাশ আছে। তবে খেলা হতে হবে শরীয়ত সম্মত ভাবে। অতএব, উদাহরণ স্বরূপ যদি খেলাধূলা করতে যেয়ে পর্দায় ব্যাঘাত ঘটে, কিংবা কোন রকম নাজাইয শর্ত রেখে খেলা হয়, তাহলে সেটা হবে অবৈধ।

মুসল্লী ভায়েরা ! আজ ঈদের দিনে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয়। সেটা হল, ঈদের দিন খুশি প্রকাশের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন দু'রাকআত নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। অনুরূপভাবে, কেউ মারা গেলে তার শেষ বিদায়ের সময়ও জানাযা নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। এদ্বারা বোঝা যায়, নামায হল মু'মিন বান্দার সুখ-দুখের সাথী। অতএব, আমরা যারা বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে গাফিলতি করি, তারা আজ ঈদ উৎসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে নামাযের পাবন্দি করার তাওফীক দান করুন।

যাইহোক, এবার আমরা কুরবানী সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করব। আজ ঈদুল আযহার দিনে নামাযের পর আমাদের দ্বিতীয় কাজ হবে কুরবানী করা। আমরা জানি, এই কুরবানীর পিছনে রয়েছে বিশাল এক ইতিহাস। নবী ইবরাহীম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামের সেই মর্মান্তিক ইতিহাস কমবেশি আমরা সকলেই জানি। বাপ হলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আর বেটা হলেন ইসমাঈল যবীহুল্লাহ। যেমন বাপ, তেমন বেটা। বাপ আল্লাহর জন্য ছেলেকে যবাই করতে রাজি আর ছেলে আল্লাহর জন্য যবাই হতে রাজি।

ঈমানদার ভায়েরা ! নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এক সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেনঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

"হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে একটি নেক সন্তান দান করুন।" এই দুআর বরকতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে ৮৬ বছর বয়সে একটি নেক সন্তান দিয়েছিলেন। তিনি হলেন ইসমাঈল যবীহুল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা সূরা স-ফ্ফাতের ১০২ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

" ইসমাঈল যখন পিতার সাথে চলার মতো বয়সে পৌঁছল, তখন পিতা ইবরাহীম তাকে বললঃ বেটা ! আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে আমি যবাই করছি। এখন তুমি কী বলছ ? " উত্তরে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বলেছিলেনঃ

يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

" আব্বাজান ! আপনি আল্লাহর আদেশ পালন করুন; আপনি দেখবেন (ইনশা আল্লাহ) আমি সবর করব !"

যাইহোক, ঘটনা আমাদের জানা। শেষমেষ, ইবরাহীম খলীলুল্লাহ, ইসমাঈল যবীহুল্লাহর গলায় ছুরি চালালেন। কিন্তু যবাই হল জান্নাতী দুম্বা । ঘটনাটি আজ থেকে ৩ হাজার ৮০০ বছর পূর্বের । সেই থেকে পিতা-পুত্রের এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি বহন করে আসছে আমাদের এই পশু কুরবানী। সুনানে ইবনে মাজা'র ৩১২৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কুরবানী হল তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ঐতিহ্য। এখানে একটা কথা বলে রাখি। আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ছেলে যবাই করার নির্দেশ স্বপ্নের মাধ্যমে দিয়েছিলেন কেন ? জিবরাঈলের মাধ্যমে সরাসরি জাগ্রত অবস্থায় দেননি কেন ? এর কারণ হিসাবে উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ আল্লাহ যদি সরাসরি জিবরাঈলের মাধ্যমে নির্দেশ দিতেন, তাহলে নিশ্চয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সন্তান যবাই করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু তিনি

জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ্য নির্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও কেবল স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত পেয়ে সন্তানের গলায় ছুরি চালালেন। এটা তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের আত্মসমর্পন ও খোদাভীতির পরিচয়। তিনি সন্তান যবাই করার মতো কঠিন কাজটি করেছিলেন শুধুমাত্র স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালার সামান্য ইঙ্গিত পেয়ে।

অতএব, কুরবানী আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মতো আত্মসমর্পন ও খোদাভীতি। আর নবী ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মতো আনুগত্য ও ধৈর্য-সবর।

সুধী শ্রোতামণ্ডলী ! আজ ঈদুল আযহার দিনে সন্তান যবাই করার পরিবর্তে পশু যবাই করা হয়। অতএব, পশুর গলায় ছুরি চালানোর সময় মনে যদি সেই ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত না থাকে, তাহলে কুরবানী কবুল হবে না। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে সূরা হজ্জের ৩৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

"আল্লাহর কাছে কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত যায় না। তাঁর কাছে যায় তোমাদের মনের তাকওয়া।" এ আয়াতে "মনের তাকওয়া" মানে হল, মনের ইখলাস, লিল্লাহিয়াত ও ভক্তি-ভালোবাসা। দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে খাঁটি নিয়তে কুরবানী করার তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে, একটা যরুরী কথা মনে রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা হজ্জের ৩৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

"কুরবানীর পশু যখন (যবাই হয়ে) যমীনে পড়ে যায়, তখন তোমরা তার গোস্ত নিজেরা খাও এবং গরীব-মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজন অতিথিদের খেতে দাও"।

উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কুরবানীর পশুর গোস্ত তিন ভাগে ভাগ করা মুস্তাহাব। এক

ভাগ নিজের জন্য। দ্বিতীয় এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনের জন্য। আর তৃতীয় ভাগ গরীব-মিসকীনদের জন্য। কোন কোন এলাকায় দেখা যায়, এলাকার গরীব-মিসকীনদের জন্য দানের গোস্ত এক জায়গায় জমা করে, সেটাকে আবার এলাকার গরীব ও ধনী সকল মানুষের মাঝে বন্টন করা হয়। মনে রাখবেন, এটা ঠিক নয়। কেননা, এভাবে তো গরীব-মিসকীনের ভাগের গোস্ত, গৃহস্তদের কাছেও পৌঁছে যায়। এ মাসআলাটি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার।

পরিশেষে, দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে আজ ঈদুল আযহার দিনে সুন্নত তরীকায় ঈদের সমস্ত পর্বগুলি আদায় করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ৭

তাকওয়া ও পরহেযগারী

যুল হিজ্জা'র দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

১২ যুল হিজ্জাহ ১৪৪২ হিজরী, ২৩ জুলাই ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ– اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يَآ اَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُواالتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِه وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ যুল হিজ্জাহ মাসের ১২ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। জুমুআর দিন আবার আইয়ামে তাশরীকের একটি দিন। আজ এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা তাকওয়া ও পরহেযগারী সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তাকওয়া মানে, পরহেযগারী ও আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয় হল শরীয়তের উপর আমল করার মূল চাবিকাঠি। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে প্রায় ১০০ জায়গায় তাকওয়ার কথা বলেছেন। যেমন, সূরা আল ইমরানের ১০২ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يَآ اَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُواالتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِه وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

"হে ঈমানদারেরা ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা দরকার। আর তোমরা কখনই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।"

সামান্য খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারব, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ৩টি নির্দেশ দিয়েছেনঃ (১) 'তাকওয়া'

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন, (২) আল্লাহকে শুধু ভয় করা নয়, বরং তাঁকে এমনভাবে ভয় করতে বলেছেন, যেমন ভাবে ভয় করা তাঁর হক, (৩) এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ তোমরা কখনই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এ নির্দেশ ৩টির উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

সুধীবৃন্দ! তাকওয়া সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানা দরকার যে, তাকওয়ার ৩টি স্তর আছেঃ সবচেয়ে নিম্নস্তরের তাকওয়া হল, শির্ক বর্জন করা। মধ্যস্তরের তাকওয়া হল, যাবতীয় কবীরা গোনাহ বর্জন করা। আর পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া হল, নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের উপর আমল করা। সূরা আল ইমরানের ১০২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে এই তৃতীয় স্তরের পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্যই মুফাসসির সম্রাট সাহাবী, হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) এ আয়াতের حَقَّ تُقَاتِهِ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ "এর মানে হল, নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে চলা। আর এ ব্যাপারে কারও তিরস্কারের পরোয়া না করা।"

কখনও এমন হয়, লোকে কী বলবে এই ভয়ে আমরা আল্লাহর বহু নির্দেশ লঙ্ঘন করে থাকি। আবার কখনও বহু ইসলাম বিরোধী প্রথা-প্রচলন পালন করি, শুধু এই ভয়ে যে, এটা না করলে লোকে কী বলবে! মনে রাখবেন, এভাবে মানুষের তিরস্কারের ভয় করা ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। এসম্পর্কে মিশকাত শরীফের ১৬৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রযি) বলেছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ

পর্যন্ত তোমাদের মনের খায়েশ আমার আনিত শরীয়তের অনুগত না হবে।" ইমাম নাবাবী বলেছেনঃ
এটা সহীহ হাদীস।

শ্রোতামণ্ডলী ! শুরুতে বলেছিঃ তাকওয়া মানে হল, আল্লাহর ভয়। অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তির ভয় করার নাম হল তাকওয়া। সুনানে তিরমিযীর ২৫৮৫ নম্বর হাদীসে লেখা আছে - "ইবনে আব্বাস (রযি) বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা আল ইমরানের ১০২ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করে জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখিয়ে বলেছিলেনঃ জাহান্নামের 'যাক্কূম' নামক গাছের এক ফোঁটা রস দুনিয়ায় পড়লে দুনিয়া ওয়ালাদের জীবনযাত্রা মুশকিল হয়ে যেত। তাহলে ভেবে দেখ, যে সব জাহান্নামীরা এটা ভক্ষণ করবে, তাদের অবস্থা কী হবে !" ইমাম তিরমিযী লিখেছেন, এটা সহীহ হাদীস। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতকে জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। এই ভয়-ই হল তাকওয়া।

সুধী শ্রোতামণ্ডলী ! প্রশ্ন হল, তাকওয়া হাসিল হয় কীভাবে ? এর জওয়াব এই যে, তাকওয়া হাসিল করার দু'টি পদ্ধতি আছেঃ (১) আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে থাকলে তাকওয়া হাসিল হয়। (২) বেশি বেশি মৃত্যু ও পরকালকে স্মরণ করলে তাকওয়া হাসিল হয়।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা তাওবার ১১৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে মু'মিন বান্দারা ! তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর আর সত্যবাদীদের সোহবত ধারণ কর।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সত্যবাদী কামেল মানুষদের সোহবতে থাকলে তাকওয়া হাসিল হয়।

আর মৃত্যু ও পরকালের স্মরণ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা হাশ্‌রের ১৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ط وَاتَّقُوا اللهَ

"হে মু'মিন বান্দারা ! তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন চিন্তা করে, সে পরকালের জন্য কী সঞ্চয় করেছে ; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর !" এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, তাকওয়া হাসিল করার মাধ্যম হল, পরকালকে স্মরণ করা।

অনুরূপভাবে, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করলেও অন্তরে তাকওয়া ও খোদার ভয় সৃষ্টি হয় । সুনানে তিরমিযীর ২৩০৭ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, আবূ হুরাইরাহ (রযি) বলেছেনঃ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِيْ الْمَوْتَ

" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মৃত্যু নামক জীবনের স্বাদ হরণকারী জিনিসটিকে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর।"

মুস্তাদ্‌রাক হাকীমের ১৩৯৫ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, সাহাবী আবূ যার গিফারী (রযি) বলেছেনঃ এক সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নসীহত করে বলেছিলেনঃ (১) তুমি কবর যিয়ারত করবে। তাহলে তুমি পরকালকে স্মরণ রাখতে পারবে। (২) তুমি মৃত ব্যাক্তিকে গোসল দেবে। কেননা, প্রাণহীন লাশের দুরাবস্থা দেখে মন গলে যায়। (৩) তুমি জানাযার নামায পড়বে। হতে পারে এর কারণে তোমার অন্তরে দুঃখ সঞ্চয় হবে। আর দুখী ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের সুশীতল ছায়াতলে সব রকম কল্যাণ হাসিল করে । এটা মুস্তাদ্‌রাক হাকীমের ১৩৯৫ নম্বর হাদীস।

এ হাদীস দ্বারা আমরা তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় হাসিল করার এমন ৩টি মাধ্যম জানতে পারলাম, যেগুলি মৃত্যুর সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে

সবসময় মৃত্যুকে স্মরণ রাখার তাওফীক দান করুন। কেননা, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে স্মরণ রাখে, সে ইবাদত-উপাসনায় মনোযোগী হয়। আর তার দ্বারা গোনাহ কম হয়। কখনও গোনাহ হয়ে গেলে, সে তাড়াতাড়ি তাওবা-ইস্তেগফার করে নেয়। দুনিয়ার প্রতি তার মোহ থাকে না। সে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হলেও তার মনে কোন আফসোছ বা হাহুতাস থাকে না। বোঝা গেল, মৃত্যুর স্মরণ তাকওয়া পরহেযগারীর মূল চাবিকাঠি।

মুসল্লী ভাই সকল ! এ পর্যন্ত তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা শেষ করছি। আমরা শুরুতে সূরা আল ইমরানের ১০২ নম্বর আয়াত দ্বারা আলোচনা শুরু করেছিলাম । এ আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেনঃ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ "তোমরা কখনই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।"

আল্লাহ তায়ালার এ কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নাম অবধারিত। তাই আমাদের প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন হল, নিজের ও পরিবারবর্গের ঈমান-ইসলামের ফিকির করা। সূরা বাকারা'র ১৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবী ইয়াকূব আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি মৃত্যুর সময় নিজের ১২ জন ছেলেকে ডেকে শেষ মুহূর্তে তাঁদেরকে ঈমান-ইসলামের উপর কায়েম থাকার অসিয়াত করেছিলেন। অথচ, তাঁর ছেলেরা ছিলেন বংশগত ভাবে নবীর আওলাদ। এমনকী সেই ১২ জন ছেলের মধ্যে একজন ছিলেন নবী ইউসুফ। আল্লাহ তায়ালা নবী ইয়াকূব আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেনঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَ نَحْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ

আয়াতের মর্মানুবাদঃ "তোমরা ইয়াকূব নবীর মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে উপস্থিত থাকলে দেখতে, তিনি নিজের

ছেলেদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা আমার মৃত্যুর পর কার ইবাদত করবে ? ছেলেরা বলেছিলঃ আমরা একমাত্র আপনার প্রভু ও আপনার বাপ দাদার প্রভুর ইবাদত করব; আমরা কেবল তাঁরই কাছে আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) হয়ে থাকব।" নবী ইয়াকূব আলাইহিস সালাম ছেলেদের মুসলিম রূপে এক আল্লাহর ইবাদত করার অঙ্গিকার নিয়ে আযরাইলকে জান কবজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

ভায়েরা ! নবী ইয়াকূব আলাইহিস সালাম যেমন নিজের আল-আওলাদের ঈমান-ইসলাম নিয়ে ভেবেছিলেন, তেমনি আমাদেরও দায়িত্ব, নিজের ও পরিবারবর্গের ঈমান-ইসলাম ও দ্বীন-শরীয়ত নিয়ে ফিকির করা । আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গের কেউ যেন প্রকৃত মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ না করি । দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে ধর্মের বিষয়ে সজাগ হওয়ার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ৮

গোনাহ ও তার ভয়াবহতা

যুল হিজ্জা'র তৃতীয় জুমুআর বয়ান
১৯ যুল হিজ্জাহ ১৪৪২ হিজরী, ৩০ জুলাই ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

نَحْمَدُه وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ যুল হিজ্জাহ মাসের ১৯ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা গোনাহ ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। বর্তমান আমরা সকলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পেরেশান হয়ে আছি। সকলে বিভিন্ন রকম বালা-মুসীবত, ক্ষয়ক্ষতি ও অশান্তির সাথে জীবন যাপন করছি। বিশেষ করে করোনার উদ্ভূত পরিস্থিতি গোটা বিশ্বকে প্রায় অচল করে দিয়েছে। এসব কিছুর কারণ কী ? কুরআন-হাদীসের আলোকে বলা যায়, আসলে এসব কিছু আমাদের গোনাহের পরিণতি। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে সূরা শূরা'র ৩০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ

" তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ আসে, তা তোমাদেরই কর্মের ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।"

ইমাম বাইহাকীর লেখা শুআবুল ঈমান কিতাবের ৯৩৫৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখনই কোন বান্দার কোন আঘাত লাগে, সেটা আঁচড় হোক অথবা হোঁচট কিংবা শারীরিক কোন কষ্ট যাইহোক না কেন, সবই বান্দার কোন না কোন গোনাহের কারণেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা তো দয়া করে বান্দার অনেক গোনাহ এমনিতেই ক্ষমা করে দেন ।

শ্রোতামণ্ডলী ! গোনাহের কারণে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ৪ রকম ক্ষতির সম্মুখীন হয়ঃ (১) গোনাহের কারণে রিযিকে বে-বরকতি আসে। মুসনাদে আহমাদের ২২৩৮৬ নম্বর হাদীসে সাহাবী সাওবান (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ

"নিশ্চয় বান্দা নিজের গোনাহের কারণে রুযী থেকে মাহরূম হয়ে যায়।"

(২) গোনাহের কারণে চেহারা ও অন্তর কালো হয়ে যায়। আল্লামা ইবনুল কইয়িম (রহ) জাওয়াবুল কাফী নামক কিতাবে ১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) বলেছেনঃ اِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِيْ الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِيْ الْقَلْبِ "নিশ্চয় গোনাহের কারণে চেহারা কালো হয়ে যায় এবং অন্তর মলিন হয়ে যায়।"

(৩) গোনাহগার মানুষকে সকলে ঘৃণা করে। সহীহ বুখারীর ১৪৬০ নম্বর হাদীসে আছে, গোনাহগার মানুষকে আল্লাহ অপছন্দ করেন আর তারপর আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈল সহ সমস্ত ফেরেশ্তারা ও গোটা সৃষ্টি জগত তাকে ঘৃণা করে। (৪) গোনাহগারের উপর সমস্ত মাখলূকাতের অভিশাপ নাযিল হয়। সূরা বাকারার ১৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ أُوْلٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ "কাফির ও গোনাহগারদের প্রতি

আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ করেন আর সমস্ত মাখলূকাত তাদের জন্য বদ দুআ করে।"

সুধীবৃন্দ ! এ হল গোনাহের কারণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ৪টি ক্ষতির দিক। এবার আসুন আমরা গোনাহের কারণে সামাজিক বালা-মুসীবত নিয়ে কিছু আলোচনা করি। আমরা এ সম্পর্কে সুনানে ইবনে মাজা'র ৪০১৯ নম্বর হাদীসটি খুব গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করি।

ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (১) যখন কোন সমাজে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, তখন তারা এমন অজানা মহামারীতে আক্রান্ত হবে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কখনও দেখা যায় নি। (২) যখন কোন সম্প্রদায় ওজন ও মাপে কম দেবে, তখন তারা দুর্ভিক্ষ, দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচারী শাসকের জুলুমের শিকার হবে । (৩) যখন কোন জাতি যাকাত-ফেতরা আদায় করা বন্ধ করে দেবে, তখন তারা অনাবৃষ্টির শিকার হবে। যদি নিরীহ পশুপাখি না থাকত, তাহলে বৃষ্টি বর্ষণ হত না। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তার রসূলের নামে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, তখন আল্লাহ তাদের উপর বিজাতীয় শত্রুকে ক্ষমতাসীন করে দেবেন। ফলে, সে তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেবে। (৫) যখন কোন সমাজের নেতারা আল্লাহর বিধান মুতাবিক বিচার করবে না, তখন আল্লাহ তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবেন।

সম্মানিত ভায়েরা ! এবার আমরা তাওবা-ইস্তিগফার সম্পর্কে আলোচনা করব । কুরআন ও হাদীস অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে, গোনাহগার বান্দার একান্ত করনীয় কর্তব্য হল, আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তাওবা-ইস্তিগফার করা। সুনানে ইবনে মাজা'র ৪২৫০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছেঃ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ "আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ গোনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি, ওই মানুষটির মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়, যে আদৌ গোনাহ করি নি।"

আল্লামা ইবনে কুদামাহ হাম্বলী (রহ) কিতাবুত তাওয়াবীনের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এক সময় নবী মুসা আলাইহিস সালামের যামানায় অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। ফলে, মানুষেরা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। নিরীহ পশু-পাখিরা পর্যন্ত পিপাসা ও অনাহারে মৃত্যুপ্রায় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। তখন বনী ইসরাঈলরা নবী মুসা আলাইহিস সালামের কাছে নিজেদের কষ্টের কথা জানিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আবেদন করেছিল। ফলে একদিন মুসা আলাইহিস সালাম কয়েক হাজার বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য একটি ময়দানে হাজির হলেন। যেহেতু সর্বস্তরের মানুষ ও প্রাণীরা সকলেই ভুক্তভোগী ছিল, তাই তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ।

মুসা আলাইহিস সালাম প্রথম দিন দুআ করেছিলেন কিন্তু বৃষ্টি হয় নি। দ্বিতীয় দিন আবার দুআ করেছিলেন কিন্তু এবারও বৃষ্টি হয় নি। তারপর তৃতীয় দিন মুসা আলাইহিস সালাম সকলকে নিয়ে ময়দানে হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ ! তুমি তো আমার দুআ কবুল করবে বলে ওয়াদা করেছিলে ! তাহলে আজ কেন আমার দুআ কবুল করছ না ? আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী আওয়াজ এল, হে মুসা ! আমি কেমন করে দুআ কবুল করব ? তোমার এই মজলিসে এমন একজন পাপীবান্দা আছে, যার বয়স ৪০ পার হয়ে গেছে, তবুও সে এখনও পাপ থেকে তওবা করিনি । আমি আল্লাহ বৃষ্টি দেওয়ার জন্য তৈরি, অথচ বান্দা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় । হে মুসা ! তুমি ঐ বান্দাকে এই মজলিস থেকে বেরিয়ে যেতে বল। তাহলে আমি বৃষ্টি দেব । মুসা আলাইহিস সালাম ময়দানে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের মাঝে ঘোষণা দিলেন, আমাদের এই মজলিসে কে আছ সেই নাফরমান বান্দা, যার

বয়স ৪০ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু এখনও সে পাপ থেকে তাওবা করিনি । আজ তার জন্য সমস্ত মাখলূকাত পেরেশান হয়ে আছে। সে এখুনি এই মজলিস থেকে বেরিয়ে যাক। মুসা আলাইহিস সালাম এভাবে ঘোষণা দিতে থাকলেন। কিন্তু কেউ বের হল না ।

তবে যে ব্যক্তি প্রকৃত পাপীবান্দা, সে তো বুঝতেই পারছিল যে, আমিই সেই হতভাগা বান্দা, যার জন্য আজ সমস্ত মাখলূক পেরেশান হয়ে আছে। এখুনি আমাকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বান্দা ভাবতে লাগল যে, সে যদি মজলিস থেকে এখনই বের হয়ে যায়, তাহলে সকলেই তাকে চিনে ফেলবে এবং ভরা মজলিসে তাকে অপদস্থ হতে হবে। ভাবতে ভাবতে বান্দার মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হল। তার পরনে ছিল একটি চাদর। সে চাদরটি মাথার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে নিজের চেহারা ঢেকে নিল। মাথা নিচু করে আল্লাহর নিকট ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল আর এই বলে দুআ করতে লাগল, মাওলা গো ! তুমি তো অন্তর্যামী, তুমি সবই জান, আমিই সেই হতভাগা পাপীবান্দা ! এই ভরা মজলিসে তুমি আমাকে অপদস্থ কর না। তুমি দয়া করে আমার যিন্দেগীর সমস্ত পাপরাশিকে ক্ষমা করে দাও। এদিকে বান্দার দু'টি চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল আর ওদিকে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল।

তখন মুসা আলাইহিস সালাম অবাক হয়ে বললেনঃ ওগো আল্লাহ ! এখনও তো কেউ মজলিস থেকে বের হল না । তাহলে তুমি বৃষ্টি দিলে কেন ? আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ হে মুসা ! আমি যে বান্দার কারণে এতদিন বৃষ্টি দেয়নি, এখন সেই বান্দার কারণেই বৃষ্টি দিলাম। সে খাঁটি মনে তাওবা করে নিয়েছে । আমি আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি । তখন মুসা আলাইহিস সালাম বললেনঃ ওগো আল্লাহ ! আমি ঐ বান্দাকে একবার দেখতে চাই। আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ হে মুসা ! যে

বান্দাকে আমি পাপী অবস্থায় সকলের সামনে নাম প্রকাশ করে অপদস্থ করিনি, সেই বান্দাকে ক্ষমা করার পর, যখন সে নেককার হয়ে গেল, তখন আমি তার নাম প্রকাশ করে কীভাবে অপদস্থ করতে পারি ! সুবহানাল্লাহ !

মুহতারম ভাই সকল ! আমরা লক্ষ্য করি, আল্লাহ তায়ালা কত বড় দয়ালু। অতএব, আমরাও নিজেদের গোনা থেকে আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তাওবা করি । নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাদের যিন্দেগীর পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ৯

নবীজির সমাজসেবা

যুল হিজ্জা'র চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৬ যুল হিজ্জাহ ১৪৪২ হিজরী, ৬ আগস্ট ২০২১)

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ أَمَّا بَعد: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا**۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা !

আজ যুল হিজ্জাহ মাসের শেষ জুমুআ। আজ আমরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমাজসেবা সম্পর্কে ৫টি বিশেষ গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তম চরিত্র চরিত্রবান করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং মানব জাতিকে তাঁর

আদর্শ ও চরিত্র অনুসরণ করে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ২১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তিনি তাদের জন্য আদর্শ, যারা ভয় করে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে ।"

সুধীবৃন্দ ! রসুলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৈশব থেকেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নবুয়ত লাভ করার আগে থেকেই তিনি জনসেবা ও আল্লাহর ইবাদত উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি হিরা পাহাড়ের নির্জন গুহায় একাধারে কয়েক দিন অবস্থান করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আবার বাড়ি এসে পুনরায় খাদ্য-খোরাক নিয়ে সেখানে যেতেন। এভাবে তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে একদিন হঠাৎ হিরা গুহায় জিবরাঈল ফেরেশতা রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। তিনি সেখান থেকে বাড়ি এসে হযরত খাদীজা রযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেনঃ আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে জ্বর এসে গিয়েছিল। তিনি হযরত খাদীজা রযিয়াল্লাহু আনহাকে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে বলেছিলেনঃ খাদীজা ! আমি আমার প্রাণের আশঙ্কা করছি ! তখন হযরত খাদীজা রযিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেনঃ আল্লাহর কসম ! আল্লাহ কখনই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা, আপনি একজন সমাজসেবী মানুষ। আপনার মধ্যে রয়েছে সমাজসেবার বিশেষ ৫টি গুণঃ (১) আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখেন, (২) অসহায়ের দায়িত্বভার বহন করেন, (৩) গরীব-মিসকীনের সাহায্য করেন, (৪) অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, (৫) বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের

সহযোগিতা করেন। সহীহ বুখারীর ৩ নম্বর হাদীসে এসব কথা বর্ণিত আছে।

ভাই সকল ! খাদীজা রযিয়াল্লাহু আনহার এ কথা দ্বারা আমরা খুবই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলাম যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সমাজসেবার বিশেষ ৫টি গুণ ছিল। যে গুণগুলি আমাদের মধ্যেও থাকা একান্ত যরুরী। প্রথম গুণঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখতেন। যে সমস্ত আত্মীয়দের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে, যেমন ভাই, বোন, খালা, ফুফু, চাচা, চাচাতো ভাই, মামা, মামাতো ভাই ইত্যাদি, এদের হক আদায় করা যরুরী। আমাদের কর্তব্য, এদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং এ ব্যাপারে উদাসীন না থাকা। আত্মীয়দের সাথে খারাপ ব্যবহার ও সম্পর্ক বিচ্ছেদ না করা।

সুনানে তিরমিযীর ১৯০৭ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে , আমিও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব।

এ হাদীস দ্বারা আমরা খুব ভাল ভাবে জানতে পারলাম যে, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা অন্ত্যন্ত যরুরী এবং এর কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন খুব খুশী হন। পক্ষান্তরে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানে হল, মহান আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। আফসোসের বিষয় হল, আমরা অনেকেই এব্যাপারে খুবই উদাসীন। আমরা কেউ কেউ আত্মীয়দের কিছু ভুলত্রুটির কারণে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকি। যদি আমরা তাদের ভুলত্রুটিকে ক্ষমার নজরে দেখে তাদের সাথে সুসম্পর্ক

বজায় রাখি, তাহলে আল্লাহর রহমত আমাদের সাথে থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

শ্রোতামণ্ডলী ! আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সমাজসেবার ৫টি গুণ ছিল। তাঁর প্রথম গুণ ছিল, তিনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুণ ছিল, তিনি অসহায়দের দায়িত্বভার বহন করতেন এবং গরীব-মিসকীনের সাহায্য করতেন।

সহীহ বুখারীর ৫৩৫৩ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اَلسَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

"বিধবা ও মিসকীনের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি, আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মতো অথবা রাতের বেলা নামাযে দণ্ডায়মান ও দিনের বেলা রোযা পালনকারীর মতো।"

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চতুর্থ গুণ ছিল, তিনি অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। মনে রাখা দরকার, মেহমানদের মেহমানদারি করা ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহীহ বুখারীর ৬১৩৫ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ শুরায়হ্ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজের মেহমানের সম্মান করে। এক দিন ও এক রাত তার জন্য ভাল খাবারের ব্যবস্থা করবে। আর মেহমানদারি তিন দিন পর্যন্ত হবে। এর অতিরিক্ত মেহমানদারি সাদকা হিসাবে গণ্য হবে। আর মেযবানকে কষ্ট দিয়ে, তার কাছে মেহমানের অবস্থান করা বৈধ নয়।" এটা সহীহ বুখারীর হাদীস।

ঈমানদার ভায়েরা ! আমাদের উচিত, বাড়িতে মেহমান এলে উদার মনে তার আপ্যায়ন করা এবং মনের মধ্যে কোন রকম কৃপণতা না রাখা। কেননা, মেহমান আমাদের বাড়ির দস্তরখানে বসে যে খাদ্য খেয়ে থাকে, সেটা হয় তার নিজের রুজি। আবুদ দারদা (রযি) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ " নিশ্চয় রুজি বান্দাকে অনুসন্ধান করে, যেমন মৃত্যু মানুষকে খুঁজে বেড়ায়।" এটা সহীহ ইবনে হিব্বানের ৩২৩৮ নম্বর হাদীস।

ভাই সকল ! নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমাজসেবার পঞ্চম গুণ ছিল, তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতা করতেন। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কখনও অর্থের মুখাপেক্ষী হয়। আবার কখনও তার সমবেদনা ও সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কখনও তার প্রয়োজন পড়ে ভাল পরামর্শের। মোটকথা, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির যে ধরণের সাহায্যের প্রয়োজন, তাকে সেভাবে সাহায্য করা উচিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ "আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজের কোন ভায়ের সাহায্য করায় লেগে থাকে।" এটা সহীহ মুসলিমের ২৬৯৯ নম্বর হাদীস।

পরিশেষে, দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমাজসেবা মূলক এই ৫টি আদর্শের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ১০

হিজরী সালের সূচনা ও মুহার্‌রমের ফযীলত

মুহার্‌রমের প্রথম জুমুআর বয়ান

৩ মুহার্‌রম ১৪৪৩ হিজরী, ১৩ আগস্ট ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ ১৪৪৩ হিজরীর প্রথম জুমুআ। আরবী ১২ মাসের মধ্যে প্রথম হল মুহার্‌রম মাস। আজ সেই মুহার্‌রম মাসের ৩ তারিখ। আজ আমরা দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবঃ (১) আরবী হিজরী সাল গণনা কীভাবে শুরু হয়েছিল ? (২) পবিত্র মুহার্‌রম মাসের ফযীলত ও কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আমল। আল্লাহ তায়ালা সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِعِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"নিশ্চয় লাওহে মাহফূযে আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা ১২, যমীন ও আসমান সৃষ্টির দিন থেকেই এ বিধান নির্ধারিত আছে। তার মধ্যে ৪ টি মাস মহাসম্মানিত।"

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ১২ মাসে হয় এক বছর। আজ পর্যন্ত গোটাবিশ্বে আল্লাহর এই বিধানের উপরই আমল হয়ে আসছে।

তাফসীরে রূহুল মাআনীতে সূরা তাওবার এই ৩৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, ১৭ হিজরীতে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার রযিয়াল্লাহু আনহুর শাসন আমলে বাসরা প্রদেশের গভর্নর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রযি), হযরত উমার

রযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি লিখে বলেছিলেনঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার নিকট থেকে আমাদের কাছে একটি চিঠি এসেছে। তাতে তারিখের জায়গায় লেখা আছে শা'বান মাস। আমরা বুঝতে পারছি না, এটা কোন্ বছরের শা'বান মাস ? আমার পরামর্শ, কোন ঐতিহাসিক দিন থেকে সাল গণনা করে আমাদের এমন একটি আলাদা বর্ষগণনা শুরু করা উচিত, যেটাকে অনুসরণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রম ও ধর্মীয় আমলসমূহ যথাসময়ে পালন করা হবে।

হযরত উমার ফারূক (রযি) আবূ মূসা আশআরী রযিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে সাহাবায়ে কিরামদেরকে ডেকে পরামর্শ করেছিলেন। সেখানে সকলের ঐক্যমতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ইসলামের বিশেষ ঐতিহাসিক দিন হল হিজরতের দিন। যেদিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, সেই দিন থেকেই আমাদের ইসলামী বর্ষগণনা করা হবে। তারপর থেকেই হিজরী সাল গণনা চালু হয়। আজ সেই হিজরী সালের ১৪৪৩ হিজরীর মুহাররম মাসের ৩ তারিখ।

ঈমানদার ভায়েরা ! এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বলে রাখি। সেটা হল, আরবী হিজরী তারিখ জেনে রাখা আমাদের উপর ফরযে কিফায়াহ। কেননা, আমাদের ধর্মীয় আমলসমূহ এই আরবী চন্দ্রমাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ ইসলামী চন্দ্রতারিখ সম্পর্কে খবরই রাখে না। বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে শতকরা ১ ভাগ মানুষও ইসলামী হিজরী তারিখ ব্যবহার করে না। অথচ এটা ইসলামের সভ্যতা। আমরা মুসলিম, আমাদের ইসলামী হিজরী তারিখ ব্যবহার করা উচিত। যদিও প্রয়োজনে বাংলা বা ইংরেজি তারিখ ব্যবহার করা জাইয আছে।

ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেছেনঃ প্রত্যেক মাসে নতুন চাঁদ দেখা ও চন্দ্রমাসের তারিখের হিসাব রাখা এবং ইসলামী হিজরী সাল গণনার হিফাযত করা মুসলিম উম্মতের উপর ফরযে কিফায়াহ। এ ফতোয়াটি 'বায়ানুল কুরআন' নামক বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থে সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে।

সুধীবৃন্দ ! এবার আমরা পবিত্র মুহার্‌রম মাসের ফযীলত ও কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আমল সম্পর্কে আলোচনা করছি। মুহার্‌রম মাসের প্রথম ফযীলতঃ আল্লাহ তায়ালা সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছেনঃ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"বছরের ১২ টি মাসের মধ্য হতে ৪ টি মাস মহাসম্মানিত।" সহীহ বুখারীর ৩১৯৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, মুহার্‌রম মাস সেই ৪ টি মাসের অন্যতম। অতএব, এমাসে যেকোন ইবাদাতের সওয়াব বহুগুণে বেশি। অনুরূপভাবে, এমাসে যেকোন পাপ করলে তার পরিণাম ও ভয়াবহতা অনেক বেশি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে এমাসে সব রকম গোনাহ থেকে হিফাযত করুন এবং বেশি বেশি ইবাদত করার তাওফীক দান করুন।

মুহার্‌রম মাসের দ্বিতীয় ফযীলতঃ সহীহ মুসলিমের ২৬৪৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহার্‌রম মাসকে شَهْرُ اللهِ বলেছেন। অর্থাৎ, মুহার্‌রম মাস হল "আল্লাহর মাস"। যেমন, কা'বা শরীফকে بَيْتُ اللهِ অর্থাৎ "আল্লাহর ঘর" বলা হয়েছে। এটা মুহার্‌রম মাসের বিশেষ একটি ফযীলত।

মুহার্‌রম মাসের তৃতীয় ফযীলতঃ মুহার্‌রম মাসের যে কোন দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে সহীহ মুসলিমের

২৬৪৫ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ

"রমাযানের রোযার পর সবচেয়ে উত্তম রোযা, আল্লাহর মাস মুহার্‌রমের রোযা।" আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুহার্‌রম মাসে একদিন রোযা রাখবে, তার একদিনের বদলায় ৩০ দিন রোযা রাখার সাওয়াব মিলবে। এটা মু'জামে তবারানীর ১১০৮১ নম্বর হাদীস। ইমাম মুনযিরী বলেছেনঃ সূত্রগত ভাবে এ হাদীসে কোন অসুবিধে নেই।

মুহার্‌রম মাসের চতুর্থ ফযীলতঃ মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখ হচ্ছে আ'শূরার দিন। এ দিনটি শুধু আমাদের শরীয়তে নয়, বরং সমস্ত নবীদের কাছে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ দিন। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ) লাতাইফুল মা'আরিফ নামক কিতাবে লিখেছেন, মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখে আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবূল করেছিলেন। এদিনে নূহ আলাইহিস সালামের নৌকা মহাপ্লাবনের পর জূদী নামক পাহাড়ে অবস্থান করেছিল। এদিনে নবী মূসা আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাঈলরা ফিরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। এদিনে ইউনুস আলাইহিস সালামের উম্মতের তাওবা কবূল হয়েছিল। এদিনে নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেট থেকে সমুদ্রের তীরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ) জামে সগীর কিতাবে ৫০৫১ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত নবীগণ আ'শূরার দিনে (অর্থাৎ, মুহাররম মাসের ১০ তারিখে) রোযা রাখতেন।

ভাই সকল ! মনে রাখবেন, আশূরার দিনে আমাদের করণীয় কর্তব্য ৩টিঃ (১) আ'শুরার দিনে রোযা রাখা সুন্নত।

এসম্পর্কে সহীহ মুসলিমের ২৬৩৬ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ কতাদাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ

"আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, আ'শূরার দিন রোযার বিনিময়ে তিনি পূর্বের এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন।"

এখানে একটি মাসআলা বলে রাখি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পেরেছিলেন যে, আশূরার দিন ইয়াহূদ ও নাসারারাও রোযা রাখে, তখন তিনি বলেছিলেনঃ আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তবে মুহার্‌রমের (১০ তারিখের সাথে) ৯ তারিখেও রোযা রাখব। সহীহ মুসলিমের ২৫৫৭ নম্বর হাদীসে এ কথা লেখা আছে।

অতএব, আশূরা উপলক্ষে শুধুমাত্র একদিন রোযা রাখা অনুত্তম। ১০ তারিখের পূর্বে ৯ তারিখেও রোযা রাখা উচিত। ৯ তারিখে সম্ভব না হলে, (১০ তারিখের সাথে) ১১ তারিখে রোযা রাখবে। যেন ইয়াহূদ ও নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য না হয়।

(২) আশুরার দিনে পরিবার বর্গের উপর আপেক্ষিক বেশি খরচ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ, অন্যান্য দিন অপেক্ষা আ'শূরার দিনে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য তুলনামূলক ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। এ সম্পর্কে ইমাম বাইহাকীর শুয়াবুল ঈমান কিতাবের ৩৫১৩ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ سَائِرِ سَنَتِهِ

"যে ব্যক্তি আশূরার দিনে আপন পরিবার বর্গের জন্য দারাজহস্তে খরচ করবে, আল্লাহ তায়ালা পুরো বছর তাকে প্রশস্ত রিযিক দান করবেন।" ইমাম বাইহাকী (রহ) চারজন সাহাবা

থেকে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করে লিখেছেন, সূত্রগত ভাবে এ মর্মের হাদীস সামগ্রিক ভাবে শক্তিশালী।

(৩) আশূরার দিনে বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করা মুস্তাহাব। কেননা, এদিনে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণপ্রিয় নাতি হযরত হুসাইন (রযি) কারবালা প্রান্তরে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন। কে শহীদ করেছিল, কীজন্য শহীদ করেছিল, সে আলোচনায় না যেয়ে বলা যায়, উম্মতের হাতেই তিনি এদিন শহীদ হয়েছিলেন। যাতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু কষ্ট পেয়েছেন। তাই এদিন উম্মতের কর্তব্য, বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করা।

পরিশেষে বলি, সহীহ বুখারীর ১২৯৭ নম্বর হাদীসে লেখা আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة

"যারা (শোকের সময়) নিজের মুখ চাপড়ায়, জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলে ও জাহেলী যুগের মতো চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।"

মনে রাখবেন, ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের সৈন্যদলের হাতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণপ্রিয় নাতি হযরত হুসাইন রযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত বরণ করাটা, নিশ্চয় মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। যা একজন নবী প্রেমিক ও খাঁটি ঈমানদার কখনো ভুলতে পারে না। তাই বলে, সেই দুঃখে জাহেলী যুগের মতো মাতম করা ঠিক নয়। হ্যাঁ, শহীদদের জন্য দুআ-খায়ের করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ১১

কারবালার ঘটনার শিক্ষনীয় বিষয়

মুহার্‌রমের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান
১০ মুহার্‌রম ১৪৪৩ হিজরী, ২০ আগস্ট ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِالصَّابِرِيْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ لا قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখ, আ'শূরার দিন। আবার শুক্রবার। সহীহ ইবনে খুযাইমার ১৭২৮ নম্বর হাদীসে হাসান পর্যায়ের সহীহ সনদে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ "সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমুআর দিন।" আজ সেই জুমুআর দিন, আবার আশূরার দিন। আশূরা সম্পর্কে আমরা গত জুমুআয় কিছু যরুরী কথা আলোচনা করেছিলাম। এই আশূরার দিনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরম স্নেহের নাতি হুসাইন (রযি) কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন। তাই অনেকে মনে করেন, এই কারবালার ঘটনার কারণেই আশূরার দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা দরকার, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এ দিনের ফযীলত ও গুরুত্ব কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়। কেননা, কারাবালার ঘটনা ঘটেছিল নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের ৫০ বছর পর। আর আশূরার দিনটি ফযীলতপূর্ণ ছিল নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানাতেও। বরং তার আগে থেকে ইয়াহূদ ও নাসারারাও এ দিনকে ফযীলতপূর্ণ

মনে করত। এমনকী পূর্ববর্তী সকল নবীগণের যুগে আশূরার দিনটি ছিল ফযীলতপূর্ণ। অতএব, আশূরার দিন মানেই কারবালার ঘটনা, এ ধারণাটি ভুল।

সায়্যিদুনা হুসাইন (রযি) ৬১ হিজরীর মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখে কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের নিষ্ঠুর সেনা বাহিনীর হাতে নির্মম ভাবে শহীদ হয়েছিলেন। ইয়াযীদ বাহিনীর সেনাপতি উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও তার সাথীরা আহ্‌লে বাইতের সম্মানের প্রতি খেয়াল না করে তাঁদেরকে নির্মম ভাবে শহীদ করেছিল। সায়্যিদুনা হুসাইন রযিয়াল্লাহু আনহুর দেহ থেকে মাথা কেটে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়েছিল। সে এক মর্মান্তিক ইতিহাস!

এখন হুসাইন রযিয়াল্লাহু আনহুর মাথা মুবারক কোথায় আছে ? এ সম্পর্কে দু'রকম বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনায় আছে, ইয়াযীদ হুসাইন রযিয়াল্লাহু আনহুর মাথা মুবারক মদীনার 'বাকী' নামক কবরস্থানে ফাতিমা রযিয়াল্লাহু আনহার কবরের পাশে দাফন করে দিয়েছিল। অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে, শাম দেশে তাঁর মাথা মুবারক দাফন করা হয়েছিল এবং সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল, যার নাম হল, মসজিদুর রা'স। অর্থাৎ, হুসাইন রযিয়াল্লাহু আনহুর মাথার মসজিদ।

সুধীবৃন্দ ! নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্‌লে বাইতের ফযীলত অপরিসীম। তাঁদের সম্মান রক্ষা করা ফরয। সহীহ মুসলিমের ৬১১৯ নম্বর হাদীসে আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় "গদীরে খুম্ম" নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের মাঝে আমার আহ্‌লে বাইতকে ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা আমার আহ্‌লে বাইতের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্ব আরোপ করার জন্য এ কথাটি তিনবার বলেছিলেন। এ দ্বারা বোঝা যায়, আহ্‌লে বাইতের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত যরুরী। কিন্তু

কারবালা প্রান্তরে তাঁদের সেই সম্মানের প্রতি কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি। এ দোষ ইয়াযীদের ? নাকি উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ? নাকি উভয়ের ? এ সম্পর্কে সবরকম মতামত পাওয়া যায়।

শ্রোতামণ্ডলী ! আমরা কারবালার ইতিহাসের দীর্ঘ বিবরণে না গিয়ে বলতে পারিঃ হুসাইন (রযি) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন (১) ধৈর্য-সবর, (২) বিনয়-নম্রতা, (৩) হকের উপর অটল থাকার দৃঢ় মানসিকতা। এই ৩টি আদর্শ হল কারবালার ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষনীয় বিষয়।

(১) হুসাইন (রযি) কারবালা প্রান্তরে কঠিন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কখনও কোন বিপদের সম্মুখীন হয় না। সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার নামই হল জীবন। আমরা যখন কোন মুসীবতে পড়ি, তখন ধৈর্য হারা হয়ে যাই। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা বাকারার ১৫৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُس وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِالصَّابِرِيْنَ

"আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, জান-মাল ও ফল-মূলের ক্ষতির মাধ্যমে অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর (হে নবী) আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সু-সংবাদ দিন।"

আল্লাহ তায়ালা নিজের নবীদেরকেও বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা নিয়েছেন। তাঁদের অনেকে কাফিরদের পক্ষ থেকে সীমাহীন যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সর্বাবস্থায় ধৈর্য-সবরের পরিচয় দিয়েছেন। অতএব, আমাদের কর্তব্য, সর্বাবস্থায় সবর করা। কথায় বলেঃ "সবরে মেওয়া ফলে।" সূরা বাকারার ১৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ والصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

" হে মু'মিনগণ ! তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্য-সবর ও নামাযের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ সবর কারীদের সাথে আছেন।"

সহীহ বুখারীর ৫৬৪১ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মুসলিম বান্দার উপর যে সব দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, রোগ-শোক ও পেরেশানী আসে, এমনকী তার শরীরে যদি কোন কাঁটা ফোটে, তবে আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে বান্দার গোনাহ-খতা ক্ষমা করে দেন।

দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রথমত আমাদেরকে বালা-মুসীবত থেকে হিফাযত করুন। দ্বিতীয়ত, কখনও বালা-মুসীবত এলে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান করুন।

যাইহোক, মূল কথায় ফিরে আসি। আমি বলছিলামঃ হুসাইন (রযি) কারবালা প্রান্তরে কঠিন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। এ দ্বারা আমরা তাঁর কাছ থেকে ধৈর্য-সবরের শিক্ষা পেয়েছি ।

(২) হুসাইন (রযি) কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদ বাহিনীর সাথে বিনয় ও নম্রতার ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর নম্রতাকে দুর্বলতা ভেবে আহ্‌লে বাইতের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছিল। ফলে, আজ তারা ইতিহাসের পাতায় কুখ্যাত হয়ে আছে আর সায়্যিদুনা হুসাইন (রযি) আজও মানুষের মাঝে অমর। আবূ হুরাইরাহ (রযি) বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

" যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নম্রতা ধারণ করবে, আল্লাহ তাকে সম্মান দান করবেন।" ইমাম সুয়ূতী (রহ) জামে সগীর কিতাবে ৬১৬২ নাম্বারে এ হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে নম্র হওয়ার তাওফীক দান করুন।

(৩) কারবালার ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়, হকের উপর অটল থাকার দৃঢ় মানসিকতা। সায়্যিদুনা হুসাইন (রযি)

যেটাকে হক বলে জেনেছিলেন, সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন। এ দ্বারা বোঝা যায়, প্রাণের বিনিময়ে হলেও হকের উপর অটল থাকা যরুরী।

সম্মানিত ভায়েরা ! আজ আশূরার দিন। আমরা গত জুমুআয় বলেছিলামঃ আশূরার দিনে কারবালার ঘটনার কথা স্মরণ করে আহ্‌লে বাইত ও শহীদগণের জন্য দুআ-খায়ের করা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে, এদিনে নিজের পরিবারবর্গের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি খরচ করা মুস্তাহাব। আর সহীহ মুসলিমের ২৬৩৬ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ কতাদাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ

"আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, আ'শূরার দিন রোযার বিনিময়ে তিনি পূর্বের এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন।" আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ১২

শয়তান ও তার চক্রান্ত

মুহার্‌রমের তৃতীয় জুমুআর বয়ান
১৭ মুহার্‌রম ১৪৪৩ হিজরী, ২৭ আগস্ট ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ
أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ **اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ** ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ মুহার্‌রম মাসের ১৭ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা ইবলীস শয়তান ও তার বিভিন্ন রকম চক্রান্ত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। আমরা জানি, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল ইবলীস শয়তান। আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফের ৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ "নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" তাই এই প্রকাশ্য শত্রু সম্পর্কে অবগত হওয়া আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত যরুরী। তা না হলে, আমরা যে কোন মুহূর্তে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাব।

আল্লাহ তায়ালা সূরা রাহমানের ১৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ "আল্লাহ জিন জাতিকে খাঁটি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন।" এই পৃথিবীতে মানব জাতির আগে জিনেরা বসবাস করত। সেই জিনদেরই একজন হল, ইবলীস শয়তান। তাফসীরে তবারীতে সূরা বাকারার ৩৪ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, ফেরেশ্তারা জিনদের মধ্য থেকে ইবলীসকে বাল্য অবস্থায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ইবলীস বহুদিন যাবত

ফেরেশ্তাদের সঙ্গে থেকে ইবাদত করে আল্লাহর নৈকট্ট লাভ করে। অবশেষে, আদম আলাইহিস সালামকে সাজদা করতে অস্বীকার করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করে দেন।

সূরা আ'রাফের ১৪ থেকে ১৭ নম্বর আয়াতগুলিতে উল্লেখ আছে, ইবলীস শয়তান জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় আল্লাহর কাছ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকা ও মানুষকে চতুর্দিক থেকে ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছিল। সহীহ বুখারীর ৭১৭১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ ابْنِ أُدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় শিরায় চলে।" এ জন্যই প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে বেঁচে থাকার দুআ করতেন এবং উম্মতকেও দুআ চাইতে বলেছেন। অতএব, একজন সচেতন ঈমানদারের কর্তব্য হল, সর্বদা শয়তানের ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকা এবং আল্লাহর কাছে তার থেকে আশ্রয় চাওয়া। আমরা কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে বলে থাকিঃ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এর মানে হল, আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ঈমানদার ভায়েরা ! এবার আমরা ইবলীস শয়তানের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ চক্রান্তের কথা আলোচনা করব। ইমাম তবারানী (রহ) মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইবলীসকে যখন দুনিয়াতে পাঠানো হচ্ছিল, তখন সে বলেছিলঃ হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে অভিশপ্ত করে দুনিয়ায় পাঠাচ্ছেন। তাই দুনিয়াতে আমার জন্য কয়েকটি সুযোগ করে দিনঃ

(১) দুনিয়ায় গিয়ে আমার থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ তোমার ঘর হল বাথরুম। এ জন্যই সুনানে আবূ দাঊদের ৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ

"নিশ্চয় এই বাথরুম গুলিতে শয়তান থাকে।" আর এ জন্যই সহীহ বুখারীর ১৪২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দুআ পড়তেনঃ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ "হে আল্লাহ ! আমি পুরুষ ও নারী দুষ্টু শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।" মনে রাখবেন, এই দুআটি পড়ে নিলে শয়তান মানুষকে আর ক্ষতি করতে পারে না।

(২) দুনিয়ায় আসার সময় শয়তান আল্লাহকে বলেছিলঃ আমি দুনিয়ায় গিয়ে বসব কোথায় ? আমার জন্য দুনিয়ায় বসার জায়গার ব্যবস্থা করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ দুনিয়ায় তোমার বসার জায়গা হল, বাজার ও রাস্তার মোড়। সহীহ মুসলিমের ৬২০৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "বাজার হল শয়তানের আড্ডাখানা।" অতএব, আমরা যারা বিনা প্রয়োজনে বাজারে কিংবা রাস্তার মোড়ে বসে টাইমপাস করি, তারা নিজেদের বিষয়ে একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখি।

(৩) শয়তান বলেছিলঃ হে আল্লাহ ! দুনিয়ায় আমার খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ মানুষেরা যে খাদ্য "বিসমিল্লাহ" না বলে ভক্ষণ করবে, সেটা হবে তোমার খাদ্য। এ দ্বারা বোঝা যায়, বিসমিল্লাহ না বলে পানাহার করলে তাতে কোন বরকত হয় না। কেননা, শয়তান তাতে ভাগ বসায়।

মনে রাখবেন, হাদীসে খাওয়া শুরু করার বিভিন্ন রকম দুআ বর্ণিত আছে। যদি সেগুলি মুখস্থ না থাকে, তাহলে কমপক্ষে বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা উচিত। তাহলে, (ইনশা আল্লাহ) শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবেন। এও মনে রাখা দরকার যে, যদি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে যায়, তাহলে খাওয়ার মাঝে মনে পড়লে বলবেঃ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَ أٰخِرَهُ

সুনানে আবূ দাউদে ২য় খণ্ডে ৫২৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, একদিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন। এমতাবস্থায় সেখানে এক ব্যক্তি "বিসমিল্লাহ" না পড়ে পানাহার করছিল। যখন তার খাদ্য এক লুকমা বাকি রয়ে গেল, তখন সে ওই শেষ লুকমাটি মুখে রাখার সময় "বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু" পড়ে নিল। তখন প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতে হাসতে বললেনঃ শয়তান শুরু থেকে এর সাথে খাচ্ছিল। শেষে যখন দুআটি পড়ে নিল, তখন শয়তান একে খাদ্যের সব বরকত ফিরিয়ে দিল।

(৪) শয়তান দুনিয়ায় আসার সময় আল্লাহকে বলেছিলঃ আমার জন্য পানির ব্যবস্থা করে দিন। তখন আল্লাহ তাকে বলেছিলেনঃ তোমার জন্য দুনিয়ায় পানি হল, মদ। সূরা মাইদার ৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ ! মদ, জুয়া, প্রতিমাপূজা ও লটারী কাটা অপবিত্র ও শয়তানী কাজ; সুতরাং তোমরা এ থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয় তোমরা সফল হবে।"

সুনানে ইবনে মাজা'র ৩৩৭১ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুদ দারদা রযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেনঃ তুমি মদ পান করবে না। কেননা, মদ পান করা হল সমস্ত পাপের চাবিকাঠি।

(৫) শয়তান আল্লাহকে বলেছিলঃ আপনি দুনিয়াতে আমার জন্য এমন কিছুর ব্যবস্থা করে দিন, যা দ্বারা আমি মানুষকে আমার পথে আহ্বান করব। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ এর জন্য তোমাকে দিলাম বাঁশি ও বাদ্য যন্ত্র। মুসনাদে বায্যারের ৭৫১৩ নম্বর হাদীসে (হাসান পর্যায়ের সহীহ সনদে) বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি আওয়াজে আল্লাহর লা'নত বর্ষণ হয়ঃ খুশির সময় বাঁশির আওয়াজ আর দুঃখের সময় ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার আওয়াজ।

(৬) শয়তান দুনিয়ায় আসার সময় বলেছিলঃ আল্লাহ ! আমি দুনিয়াতে কী পড়ব ? আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ তোমাকে পড়ার জন্য দিলাম অশ্লীল কবিতা ও গান। সুনানে আবূ দাঊদে ৪৯২৭ নম্বর হাদীসে আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ "গান-বাজনা অন্তরে নেফাক সৃষ্টি করে।"

অতএব, বিশেষ করে আমাদের যুব সমাজকে বলব, গান-বাজনা বর্জন করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে মোবাইলের মাধ্যমে যে সমস্ত অশ্লীল ও অনর্থক খেলাধুলার প্রোগ্রামে সময় নষ্ট করা হয়, এসব অবশ্যই বর্জনীয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হিফাযত করুন।

(৭) শয়তান দুনিয়ায় আসার সময় বলেছিলঃ হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমার লেখা কী হবে ? আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ তোমার লেখা হবে শরীরে ট্যাটু বানানো। আমরা দেখে থাকি, বে-দ্বীন যুবক-যুবতীরা নিজেদের শরীরে কোন নকশা, কিংবা নাম, অথবা দেব-দেবীর কোন চিহ্ন ইত্যাদি বানায়। এটা সম্পূর্ণ হারাম ও গোনাহে কবীরা। সহীহ বুখারীর ৫৯৪৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ ব্যক্তিদের উপর লানত করেছেন।

(৮) শয়তান আল্লাহকে বলেছিলঃ হে আল্লাহ ! দুনিয়াতে আমার বাণী কী হবে ? তখন আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ মানুষের মিথ্যা কথা হবে তোমার বাণী। সহীহ বুখারীর ৩৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মিথ্যা বলা মুনাফিকের নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মিথ্যা বলা থেকে হিফাযত করুন। চার জন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ

"মু'মিন বান্দার মধ্যে সব রকম কুঅভ্যাস থাকতে পারে কিন্তু সে আমানতে খিয়ানত করতে পারে না ও মিথ্যা কথা বলতে পারে না।" এটা মুসনাদে আহমাদের ২২১৭০ নম্বর হাদীস।

(৯) শয়তান দুনিয়ায় আসার সময় আল্লাহকে বলেছিলঃ হে আল্লাহ ! দুনিয়ায় আমার বার্তাবাহক হবে কারা ? তখন আল্লাহ বলেছিলেনঃ তোমার বার্তাবাহক হবে জ্যোতিষীরা। সুনানে তিরমিযীর ১৩৫ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে এসে তার ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করল, সে নবীর উপর অবতীর্ণ দ্বীনকে অস্বীকার করল।" সহীহ মুসলিমের ৫৭১৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে গিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে, তার ৪০ দিনের নামায কবূল হবে না। অতএব, সাবধান ! আমরা যেন কোন জ্যোতিষী, গণক, হস্তরেখাবিদ, ভবিষ্যদ্‌বক্তা প্রভৃতি ধোঁকাবাজদের কাছে কখনই না যাই।

(১০) শয়তান আল্লাহকে বলেছিলঃ হে আল্লাহ ! দুনিয়ায় আমার শিকার ধরার ফাঁদ কী হবে ? আল্লাহ তায়ালা

বলেছিলেনঃ তোমার ফাঁদ হবে, নারীজাতি। সহীহ বুখারীর ৫০৯৬ নম্বর হাদীসে উসামাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন ফেতনা রাখিনি।"

সুধীমণ্ডলী ! আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ) ইগাসাতুল লাহফান নামক কিতাবে ১ম খণ্ডের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় এ দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করে লিখেছেন, এ হাদীসের সমর্থনে বহু হাদীস রয়েছে এবং এর প্রত্যেকটি কথা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই ১০ টি বিষয়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে ইবলীস শয়তান ও তার সমূহ চক্রান্ত থেকে হিফাযত করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ১৩

আল্লাহর ৫টি বিশেষ নিয়ামত

মুহার্‌রমের চতুর্থ জুমুআর বয়ান
২৪ মুহার্‌রম ১৪৪৩ হিজরী, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ، أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ আমি আপনাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা ইবরাহীমের ৩৪ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا

"তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গুণতে চাও, তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।" বোঝা গেল, আমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য। এই অসংখ্য নিয়ামত সমূহের মধ্য থেকে ৫টি নিয়ামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমি সেই বিশেষ ৫টি নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা নাহ'লের ৯৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَاللهِ بَاقٍ ط

" তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা হল স্থায়ী।"

আমরা লক্ষ্য করি, এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ " তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে।" আমাদের কাছে আছে- জীবন-যৌবন, অর্থ-সম্পদ, সুখ-শান্তি, প্রভৃতি নিয়ামত। এসব

একদিন শেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহর কাছে পরকালে যে সমস্ত নিয়ামত আছে, তা কখনই শেষ হবে না।

এ আয়াত দ্বারা আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যে সব নিয়ামত পেয়েছ, তা অস্থায়ী। যদি তোমরা এই নিয়ামতগুলির কদর করে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার কর, তাহলে এর পরিবর্তে আল্লাহর কাছে পাবে সুখ-শান্তির চিরস্থায়ী নিয়ামত। বোঝা গেল, পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত পেতে হলে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামতের কদর করতে হবে।

হযরত আমর ইবনে মাইমূন (রহ) হতে বর্ণিত আছে, একদিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرِمِكَ ؛ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ؛ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ؛ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ؛ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"তুমি পাঁচটি নিয়ামতের কদর কর পাঁচটি জিনিসের পূর্বেঃ (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনের কদর কর। (২) অসুস্থ হওয়ার আগে তোমার সুস্থতার কদর কর। (৩) দরিদ্র হওয়ার আগে তোমার ধন-সম্পদের কদর কর। (৪) ব্যস্ততা আসার পূর্বে তোমার খালি সময়কে কাজে লাগাও। (৫) মৃত্যু আসার আগে তোমার জীবনকে কাজে লাগাও।" এটা ইমাম নাসায়ী'র সুনানুল কুবরা'র ১১৮৩২ নম্বর হাদীস। এ হাদীসে এমন ৫টি নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে, যা ক্ষণস্থায়ী। অতএব, আমাদের কর্তব্য হল, এই নিয়ামতগুলিকে সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করা। নিয়ামত ৫টি হল এইঃ

(১) যৌবন কাল আল্লাহর একটি বড় নিয়ামতঃ যৌবন, জীবনের অতি মূল্যবান সময়। এ সময় মানুষ থাকে শক্তিশালী। কোন কাজ করার ইচ্ছে করলে সহজেই তা করতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ দেখা যায়, মানুষ নিজের যৌবন কাল অহেতুক ও

দুনিয়াবী কাজ-কর্মে কাটিয়ে দেয়। যৌবন কালে মনে করে যেন এখনো তার ধর্ম করার সময় আসেনি। অথচ যৌবন কালই হল ইবাদতের আসল সময়। সহীহ বুখারীর ৬৬০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যৌবন কালে ইবাদত কারী ব্যক্তি হাশর মাঠে আল্লাহর রহমতের ছায়া পাবে। ইমাম সুয়ূতী জামে সগীরের ৪৯১১ নম্বর হাদীসে বর্ণনা করেছেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُوْنِ

"যৌবন পাগলামির একটি শাখা।" মানুষ সাধারণত যৌবনের উন্মাদনায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, যৌবন কাল বৃথা কাজে নষ্ট করে। তাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নসীহত করে বলেছেনঃ "বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনের কদর কর।" আল্লাহ তায়ালা আমাদের যুব সমাজকে যৌবনের কদর করার তাওফীক দান করুন।

(২) সুস্থতা আল্লাহর একটি বড় নিয়ামতঃ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "অসুস্থ হওয়ার আগে তোমার সুস্থতার কদর কর।" আমরা বেশির ভাগ মানুষ সুস্থতার কদর করি না। সুস্থ অবস্থায় কাজে গাফিলতি করি। মনে করি, পরে করব কিন্তু পরে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"আল্লাহর দু'টি নিয়ামতের বিষয়ে অনেক মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়ঃ (১) সুস্থতা, (২) খালি সময়।" আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে এ নিয়ামত দু'টির কদর করার তাওফীক দান করুন।

(৩) ধন-সম্পদ আল্লাহর একটি বড় নিয়ামতঃ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "দরিদ্র হওয়ার আগে

তোমার ধন-সম্পদের কদর কর।" কোন মালদার ব্যক্তি এ গ্যারান্টী দিতে পারে না যে, তার ধন-সম্পদ চিরদিন থাকবে। বরং আমরা প্রায়ই দেখে থাকি, কাল যে মালদার ছিল, আজ সে বড় নিঃস্ব। অতএব, আল্লাহ যাদেরকে মাল দিয়েছেন, তাদের উচিত যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, অসহায়দের সহযোগিতা করা এবং কোন রকম টালবাহানা না করে আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ আল্লাহর মনোনীত পথে ব্যয় করে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করা। মনে রাখবেন, কুরআনে আছে, আল্লাহ পথে ব্যয় করা মানে আল্লাহকে ঋণ দেওয়া। শুধু ঋণ নয়, বরং এটা হল উত্তম ঋণ। সূরা হাদীদের ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

مَنْ ذَاالَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

" কে আছে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেবে ? বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য সেটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।"

শ্রোতামণ্ডলী ! লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তায়ালা কেমন মেহেরবান ! এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের দেওয়া মাল তাঁর মনোনীত পথে দান করাকে উত্তম ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করছেন এবং এর প্রতিদান হিসাবে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। পক্ষান্তরে, যারা দান-সাদকা করার ব্যপারে কৃপণতা করে, তাদের সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ৬৪৪৪ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূযার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যারা অধিক সম্পদের মালিক, তারা কিয়ামতের দিন খুব কম সওয়াবের অধিকারী হবে। তবে যারা সর্বদিক দিয়ে সৎপথে ব্যয় করে, তারা ব্যতিক্রম। আর এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।"

অনেক সময় দেখা যায়, মালদার ব্যক্তি হজ্জ করায় টালবাহানা করে। অবশেষে হজ্জ না করেই তার মৃত্যু হয়। কখনও যাকাত দিতে চায় না। কিংবা রীতিমতো হিসাব করে

যাকাত না দিয়ে কেবল নামে মাত্র কিছুটা যাকাত দিয়ে দায় সেরে নেয়। আবার কখনও ধন-সম্পদের অহংকারে বিভিন্ন রকম গর্হিত কাজে মেতে ওঠে। সে এ কথা ভুলে যায় যে, একদিন হয়ত তাকে অভাব-অনটনের মুখ দেখতে হবে। সেদিন তার উপায় কী হবে ? এজন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "দরিদ্র হওয়ার আগে তোমার ধন-সম্পদের কদর কর।" আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর হাবীবের এ নসীহতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

(৪) খালি সময় আল্লাহর একটি বড় নিয়ামতঃ এজন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "ব্যস্ততা আসার পূর্বে তোমার খালি সময়কে কাজে লাগাও।" আরবীতে একটি প্রবাদ আছেঃ اَلْوَقْتُ أَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ

"সময় সোনার চেয়ে দামী।" সোনা হারিয়ে গেলে আবার খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু সময় চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। ইমাম সুয়ূতীর লেখা জামে সগীর কিতাবে ৪৬১৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ একবার "সুবহানাল্লাহ" বললে নেকি ওজন করার অর্ধেক পাল্লা সাওয়াবে ভরে যায়। আর একবার "আল হামদুলিল্লাহ" বললে নেকি ওজন করার পাল্লা পুরোটাই সাওয়াবে ভরে যায়। আর একবার "আল্লাহু আকবার" বললে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা পরিমাণ সাওয়াব মেলে।

সুধীমণ্ডলী ! তাহলে লক্ষ্য করুন, সামান্য "সুবহানাল্লাহ" কিংবা "আল হামদুলিল্লাহ" অথবা "আল্লাহু আকবার" বলার সময়ের মূল্য কতটা ! অতএব, বর্তমান আমরা যারা সেই অমূল্য সময়কে উদাহরণ স্বরূপ মোবাইলের পিছনে ব্যয় করি, তারা কতই না হতভাগা ! বর্তমান আমাদের যুবসমাজ মোবাইলে গেম খেলায় মেতে উঠেছে। তারা এতে নিজেদের জীবন, যৌবন, অর্থ-সম্পদ সবকিছু বিনষ্ট করছে। এ ধরণের মানুষদেরকে সতর্ক

করে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "ব্যস্ততা আসার পূর্বে তোমার খালি সময়কে কাজে লাগাও।" কেননা হতে পারে তুমি এমন ব্যস্ততার সম্মুখীন হয়ে পড়বে যে, তখন সৎকাজ করার ইচ্ছে থাকলেও তা করার সময় থাকবে না। বোঝা গেল, সময়ের মূল্য দিতে হবে।

(৫) জীবন আল্লাহর একটি বড় নিয়ামতঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা বাকারার ২৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কেমন করে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হতে পার ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার মৃত্যু দেবেন। পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। তখন তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।"

সুধীবৃন্দ ! নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মৃত্যু আসার আগে তোমার জীবনকে কাজে লাগাও।" জীবনের এ সামান্য কয়েকটি দিনই হল আমাদের মূল পুঁজি। আমাদের জীবনের যে দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমরা সেদিনগুলি আর ফিরে পাব না। আগামীতে আমাদের জীবনের কতটুকু বাকি আছে, আমরা তা বলতে পারি না। কথায় বলেঃ " নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই।" ভবিষ্যতের ইল্‌ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাহলে রয়ে গেল জীবনের এই বর্তমান সময়টুকু। আবার বলছিঃ জীবনের বিগত দিনগুলি কেটে গেছে। আর ভবিষ্যতের কোন গ্যারান্টী নেই। অতএব, আছে শুধু বর্তমান সময়টুকু। সুতরাং, আসুন আমরা সকলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে কাজে লাগিয়ে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের শান্তির ব্যবস্থা করে নিই।

দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ মহা মূল্যবান নসীহত ৫টির উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

বয়ান নম্বর ১৪

মানুষ কেন আশরাফুল মাখলূকাত

সফর মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

২রা সফর ১৪৪৩ হিজরী, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ أٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا**۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! আজ সফর মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, মানুষ কেন আশরাফুল মাখলূকাত ? আমরা জানি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হল সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলূক। আল্লাহ তায়ালা সূরা বনী ইসরাঈলের ৭০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ أٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সম্মান দান করেছি, তাকে জলে ও স্থলে চলাচলের জন্য যানবাহন দিয়েছি, পবিত্র রুযী দান করেছি এবং তাকে অসংখ্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলূক। এবার জানার বিষয় হল, মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী ?

মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ যদি হয় তার কোন কিছু তৈরী করার দক্ষতা, তাহলে মৌমাছি আশরাফুল মাখলূকাত হল না কেন ? আমরা মৌমাছির চাক দেখেছি। মৌমাছি কী আজব

পদ্ধতিতে চাক তৈরি করে তাতে মধু জমা করে, একটু ভেবে দেখুন !

বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী ইমাম কযবীনী (রহ) আজাইবুল মাখলূকাত কিতাবে ৩৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল, মৌমাছি তার চাকে কোন স্কেল ও মাপযন্ত্র ছাড়া অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ছ'কোণ বিশিষ্ট হাজার হাজার ঘর নির্মাণ করে। তার সব ঘরগুলি হয় ছ'কোণা। একটাও চারকোণ, পাঁচকোণ বা গোলাকার নয়। তার ছ'কোণ বিশিষ্ট ঘরের প্রত্যেকটি কোণ হয় সমান। কোন একটি কোণ ছোট-বড় কিংবা ব্যাঁকা-ট্যারা হয় না। যাতে করে গোটা চাকের মধ্যে যেন সামান্যতম জায়গা খালি পড়ে না থাকে এবং বেশি বেশি মধু সংগ্রহ করে রাখতে পারে। মৌমাছি তার ঘর চারকোণা, পাঁচকোণা কিংবা গোল বানায় না কেন? বর্তমান যুগের একজন ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানী তা ভেবে মৌমাছির বুদ্ধি ও দক্ষতা দেখে অবাক না হয়ে পারে না।"

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদের ১১৪ টি সূরার মধ্যে একটি সূরা মৌমাছির নামে নাযিল করেছেন। সূরাটির নাম হল, সূরাতুন্ নাহ্ল। নাহ্ল মানে মৌমাছি। এটি কুরআন মজীদের ১৬ নম্বর সূরা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ সূরার ৬৮ ও ৬৯ নম্বর আয়াতে মৌমাছির চাক তৈরি ও মধু সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

" নিশ্চয় এতে বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" ভাই সকল ! এ জন্যই আমি বলছিলামঃ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ যদি হয় তার কোন কিছু বানানোর দক্ষতা, তাহলে এই মৌমাছি আশরাফুল মাখলূকাত হল না কেন ?

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ যদি হয় তার দক্ষতা ও কারিগরি ক্ষমতা, তাহলে বাবুইপাখি আশরাফুল মাখলূকাত হল না কেন ? আমরা তাল গাছে বাবুই পাখির বাসা ঝুলতে দেখেছি।

একজন গৃহস্ত জমিদারের বিশাল বাসভবনে যা কিছু থাকে, বাবুই পাখির ছোট্ট একটি বাসায় তার সব কিছুই থাকে। তাও আবার আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে। কোন মানুষ বাবুই পাখির মতো একটি বাসা তৈরি করতে পারবে কি ? কক্ষনো না। এক্ষেত্রে বুদ্ধি, দক্ষতা ও কারিগরি ক্ষমতায় মানুষ বাবুই পাখির কাছে হার মানে। এই বাবুইপাখি আশরাফুল মাখলূকাত হল না কেন ?

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ যদি হয় তার চিকিৎসা বিদ্যা, তাহলে বহু প্রাণী তো চিকিৎসা বিদ্যায় মানুষের চেয়ে কম নয়, তবে তারা কেন আশরাফুল মাখলূকাত হল না ? আমরা অনেকে মনে করি, মানুষই একমাত্র চিকিৎসাবিদ। মনে রাখবেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এ সম্পর্কে আমরা একটি ঘটনা লক্ষ্য করিঃ

ঘটনাটি 'হুকূক ও ফারাইয' নামক কিতাবে লেখা আছে। পাকিস্তানের পেশাওয়ার শহরের ঘটনা। এক সময় পেশাওয়ার শহরের কোন এক এলাকায় হনুমানের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল। এলাকার বাসিন্দারা খুব পেরেশান হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে, একজন গৃহস্ত বাড়ি ওয়ালা হনুমানের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য একটি পরিকল্পনা করল। সে একদিন বাজার থেকে আটা ও বিষ কিনে এনে রুটি তৈরি করে তাতে বিষ মাখিয়ে ঘরের ছাদের উপরে রুটিগুলি ছড়িয়ে দিল। সে মনে করেছিল, হনুমানেরা এসে বিষ মাখানো রুটি খেয়ে মারা যাবে। সে এই ভেবে রুটিগুলি ছড়িয়ে দিয়ে ছাদের চিলেকোঠা অর্থাৎ সিঁড়ির ঘরে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। সে দেখল, কিছুক্ষণ পর একদল হনুমান লাফাতে লাফাতে ছাদের উপর রুটির কাছে এল। তারপর তারা রুটিগুলি ঘিরে একত্রিত হয়ে বসে পড়ল এবং সেগুলি শুঁকতে লাগল। তারপর তারা একে অপরের সাথে কী যেন বলাবলি করল আর তারপর সকলে জঙ্গলে চলে গেল। বাড়ি ওয়ালা চিলেকোঠা থেকে সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। সে দেখল, কিছুক্ষণ পর হনুমানগুলি আবার ফিরে এল। এবার

তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল পাতা বিশিষ্ট একটি গাছের ডাল। তারা এসে রুটিগুলি নিয়ে গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপর রুটিগুলি টুকরো টুকরো করে একটি করে গাছের পাতার সাথে এক টুকরো রুটি খেতে লাগল। এভাবে সমস্ত রুটি খেয়ে ফেলল। বিষে তাদের কোন ক্ষতিই হল না। তারপর হনুমানগুলি সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবেই আবার জঙ্গলে চলে গেল।

সম্মানিত ভায়েরা ! আমি বলছিলামঃ বহু প্রাণী এমন আছে, যারা চিকিৎসা বিদ্যায় মানুষের চেয়ে কম নয়। ওই হনুমানগুলি কি বিষের ওষুধ মানুষের চেয়ে কম জানত ? তাহলে, এ সব প্রাণীরা আশরাফুল মাখলূকাত হল না কেন?

শূন্যে ওড়া যদি হয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাহলে ঈগলপাখি কেন আশরাফুল মাখলূকাত হল না ? ডুবুরি সেজে সমুদ্রের তলদেশে সাঁতার কাটা যদি হয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ, তাহলে তিমিমাছ কেন আশরাফুল মাখলূকাত হল না ? দৃঢ় মনোবল ও শক্তি-সাহসের কারণে মানুষ যদি আশরাফুল মাখলূকাত হয়ে থাকে, তাহলে জঙ্গলের বাঘ ও সিংহ আশরাফুল মাখলূকাত হল না কেন ? কেন আফ্রিকার জঙ্গলের বিশাল আকারের হাতিকে বাদ দিয়ে ক্ষুদ্র মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাতের সম্মান দেওয়া হল ? আসুন, আমরা এর মূল কারণ খতিয়ে দেখি।

সুধীবৃন্দ ! বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ হল, মানুষের আছে এমন এক বিশেষ বিবেক-বুদ্ধি, যার ফলে মানুষের মিলেছে ঈমান ও ইল্‌মে ইলাহী। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দান করেছেন বিশেষ বিবেক, যার বরকতে মানুষ পেয়েছে (১) ঈমান, (২) ইল্‌ম। এ দু'টি জিনিস হল উচ্চ মর্যাদা লাভের বিশেষ কারণ। আল্লাহ তায়ালা সূরা মুজাদালার ১১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

"তোমাদের মধ্যে যাদের ঈমান ও ইল্‌ম আছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান ও ইল্‌মে এলাহী- এদু'টি গুণের বরকতে মেলে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব, যদি কেউ এ দুনিয়াতে মানুষ রূপে জন্ম নেয় কিন্তু তার মধ্যে না আছে ঈমান আর না আছে ইল্‌মে ইলাহী, এরূপ মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত বলা যায় না। তারা চতুস্পদ প্রাণীর মতো। বরং তারা চতুস্পদ প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহ তায়ালা সূরা আ'রাফের ১৭৯ নম্বর আয়াতে এ কথাই বলেছেনঃ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"এরা চতুস্পদ প্রাণীর মতো; বরং এরা চতুস্পদ প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই হল (পরকাল থেকে) গাফেল।"

শ্রোতামণ্ডলী ! নিশ্চয় আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম কারণ হল ঈমান। যদি ঈমান না থাকে, তাহলে মানুষ হবে জাহান্নামের কাঠ। আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারা'র ২৪ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"তোমরা সেই জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যার কাঠ হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।"

ঈমান বিহীন মানুষের কোন আমল কবূল হয় না। সহীহ মুসলিমের ৪০৬ নাম্বারে হযরত আইশা সিদ্দীকাহ (রযি) থেকে এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি এক দিন বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! জাহিলী যুগে ইবনু জুদআন (নামে মানুষটি) আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করত ও গরীব-মিসকীনদেরকে খেতে দিত। তার এ সব আমলের সওয়াব মিলবে কি ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ না। কেননা, সে কোন দিন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিনি। এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, ঈমান বিহীন মানুষের কোন আমলই কবূল হবে না।

ঈমান বিহীন কোন আমল কবূল না হওয়ার পিছনে যুক্তিও আছে। ধরুন, কোন মানুষ যদি চিঠি লেখে কিন্তু চিঠির কোন ঠিকানা না লেখে, তাহলে কি চিঠি গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছবে ? কক্ষনো না। সোনার কলম ও জাফরানের কালি দিয়ে লিখলেও ঠিকানা বিহীন চিঠি হবে বেকার। অনুরূপভাবে, ঈমান বিহীন আমল হয় বেকার। অতএব, আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য ঈমানের হিফাযত করা। বিশেষ করে, আজ এই ফেতনার যুগে ঈমান সম্পর্কে সজাগ থাকা অত্যন্ত যরুরী। কেননা, আমরা সেই যামানার মানুষ, যে যামানা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে গেছেন। সুনানে তিরমিযীর ২১৯৫ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছেঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ أَحَدُهُمْ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا

আবূ হুরাইরাহ (রযি) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা অমবস্যা রাতের অন্ধকারের মতো ফেতনা ছড়িয়ে পড়ার আগে নেক আমল করে নাও। তখন মানুষ সকালে হবে মু'মিন, সন্ধ্যায় হবে বেঈমান। আবার সন্ধ্যায় হবে মু'মিন, সকালে হবে বেঈমান। মানুষ সামান্য দুনিয়া পাওয়ার জন্য নিজের দ্বীন-ধর্মকে বিক্রি করে দেবে।"

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বলছিলাম, মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত হয়েছে ঈমান ও ইল্‌ম সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে। এ পর্যন্ত আমরা ঈমান সম্পর্কে কিছু কথা শুনলাম। এবার আসুন ইল্‌ম সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করি। মনে রাখবেন, ইল্‌মের কারণেই মানুষ হয়েছে ফেরেশতাদের কিবলা। অর্থাৎ, ফেরেশতারা আদম আলাইহিস সালামকে সাজদাহ করে সম্মান জানিয়েছিল এই ইল্‌মের কারণেই।

আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারা'র ৩০ নম্বর আয়াত থেকে ৫টি আয়াতের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশতাদের কাছে মানুষ সৃষ্টির কথা বলেছিলেন। তখন ফেরেশতারা বলেছিলঃ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ আমরা তো তোমার গুণকীর্তন করি ও তোমার সত্তার পবিত্রতা বয়ান করি।" অর্থাৎ আমরা ফেরেশতারা যখন তোমার যথেষ্ট ইবাদত করে থাকি, তখন মানুষ সৃষ্টির কী প্রয়োজন আছে ? আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।" তারপর আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁকে ইল্‌ম দান করলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালাম ও ফেরেশতাদেরকে পরীক্ষা নিয়ে ছিলেন। সেই পরীক্ষার মাধ্যমে আদম আলাইহিস সালামের ইল্‌মের যোগ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্মান জানানোর জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আদমকে সাজদাহ কর। তখন সকলেই তাঁকে সাজদাহ করেছিল। সাজদাহ করেনি ইবলীস শয়তান। সে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারেনি। ফেরেশতারা মানুষের ইল্‌মের যোগ্যতা ও মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল আদম আলাইহিস সালামকে সম্মান মূলক সাজদাহ জানিয়ে।

মুহতারম মুসল্লী ভাই সকল ! এ দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, ঈমান ও আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ইল্‌মের কারণেই মানুষ হয়েছে আশরাফুল মাখলূকাত। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বেশি বেশি ঈমান ও ইল্‌মে ইলাহী হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বার আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বয়ান নম্বর ১৫

ইল্‌মের গুরুত্ব

সফর মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

৯ সফর ১৪৪৩ হিজরী, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ **وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ** ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ আমি ইল্‌ম ও শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ্। মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল ঈমান। আর ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হল, ইল্‌ম, অর্থাৎ শিক্ষা। সহীহ বুখারীর ৭১ নম্বর হাদীসে হযরত মুআবিয়া (রযি) হতে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, দুনিয়াবী নিয়ামত বা ধন-সম্পদের চেয়ে ইল্‌মের মূল্য অনেক বেশি। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মাল-দৌলত বেঈমান-বেদ্বীনদেরকেও দান করেন কিন্তু দ্বীনের জ্ঞান তাকেই দেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন।

এই ইল্‌মের কারণেই আমাদের আদিপিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ফেরেশতাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া

হয়েছিল। সূরা বাকারার ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

"আল্লাহ আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম শেখালেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেনঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে এ জিনিসগুলির নাম বলে দাও।" তখন ফেরেশতারা আল্লাহকে বলেছিলঃ আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন কিছুই জানা নেই। তখন আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে বলেছিলেনঃ ফেরেশতাদেরকে এসব জিনিসের নাম বলে দাও। তখন তিনি তাঁদেরকে সে সব জিনিসের নাম বলে দিয়েছিলেন। তখন ফেরেশতারা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করে আদমকে সম্মানের সাজদাহ করেছিল। বোঝা গেল, ইল্‌মের কারণেই ফেরেশতাদের উপর আদম আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

তফসীরে তবারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, ইবনে আব্বাস (রযি) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদেরকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি পৃথিবীতে নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাইছেন, তখন ফেরেশতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল যে, আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছে সৃষ্টি করতে পারেন, তবে তিনি আমাদের চেয়ে উত্তম ও সম্মানিত কাউকে সৃষ্টি করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করবেন, তার চেয়ে আমাদের জ্ঞান বেশি হবে। কেননা, আমাদেরকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আমরা বহু এমন জিনিস দেখেছি, যা সে দেখেনি। মোটকথা, ফেরেশতারা নিজেদের ইল্‌মের কারণে গর্বিত ছিল। তারপর আল্লাহ তায়ালা

আদম আলাইহিস সাল্লামকে সৃষ্টি করে তাঁকে বিশেষ ইল্‌ম দান করে ফেরেশতাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

শ্রোতামণ্ডলী ! কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। তাতে সর্বপ্রথম পড়ার নির্দেশ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ " তোমার রবের নাম নিয়ে পড়, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" শিক্ষার গুরুত্ব কতটা, এ আয়াত দ্বারা আমরা তা সহজেই বুঝতে পারি। কেননা, কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বহু জিনিসের আদেশ করেছেন কিন্তু তার মধ্যে সর্বপ্রথম আদেশ হল- اِقْرَأْ "তুমি পড়"।

এ আয়াতে আমাদেরকে দু'টি জিনিস শিক্ষা দেওয়া হয়েছেঃ (১) তাওহীদ, (২) ইল্‌ম হাসিল করা। তাওহীদ মানে, আল্লাহর একত্ববাদ। শুধুমাত্র আল্লাহই হলেন সবকিছু সৃষ্টিকারী। কেউ তার শরীক নেই। اَلَّذِىْ خَلَقَ কথার অর্থ এটাই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এটা হল ঈমান।

তফসীরে মাআরিফুল কুরআনে লেখা আছে, "সূরা আলাকের ২ নম্বর আয়াতে মানুষ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। তারপর ৩ নম্বর আয়াতে ইল্‌ম হাসিল করার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হল, একমাত্র ইল্‌মের কারণেই মানুষ হয়েছে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে পৃথক, আশরাফুল মাখলূকাত।" আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা যুমারের ৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"হে নবী ! আপনি জিজ্ঞেস করুন, যারা জ্ঞান রাখে আর যারা জ্ঞান রাখে না, এরা উভয়ে কি সমান ?" সূরা মুজাদালার ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আর যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন।"

সুধীবৃন্দ ! এবার আমরা আলোচনা করব, ইল্‌ম কতটা হাসিল করতে হবে ? শিক্ষার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "ইল্‌ম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয।" এটা হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত সুনানে ইবনে মাজা'র ২২৪ নম্বর হাদীস। এখন প্রশ্ন হল, কতটা ইল্‌ম হাসিল করা ফরয ? এর জওয়াবে মনে রাখতে হবেঃ

"হুকূকুল্লাহ" ও "হকূকুল ইবাদ"-- এই দু'রকম জিনিসের ইল্‌ম হাসিল করা প্রত্যেক মানুষের জন্য জরুরী। "হুকূকুল্লাহ" মানে, আল্লাহর হক। অর্থাৎ, বান্দার উপর আল্লাহর যে সমস্ত হক আছে। আর "হকূকুল ইবাদ" মানে, বান্দাদের হক। যেমন, বাপ-মা, ভাই-বোন, পরিবার -পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্যান্য মানুষের হক। এ দু'রকম হক আদায় করা ফরয। অতএব, এগুলি জানা এবং এ সম্পর্কে ইল্‌ম হসিল করাটাও ফরয।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইল্‌মকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ (১) প্রাথমিক ইল্‌ম, (২) উচ্চ পর্যায়ের ইল্‌ম। দ্বীনের প্রাথমিক ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরযে আইন। হাদীসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইল্‌ম হাসিল করা ফরয, এর মানে হল, দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা হাসিল করা ফরয। অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য তা জানা জরুরী, যা না জানলে তার উপর যে ফরয ও ওয়াজিবগুলি আছে, তা আদায় করতে পারবে না। আর না পারবে হারাম থেকে পরহেয করতে। যেমন, ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাহ সমুহের জ্ঞান অর্জন করা, পাক-নাপাক ও অন্যান্য জরুরী ইবাদতের মাসআলা-মাসায়েল জানা। যার উপর যাকাত ফরয, তার জন্য যাকাতের মাসআলা-মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন করা। যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তার জন্য হজ্জের মাসআলা

জানা। যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায়, তার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের হুকুম-আহকামের জ্ঞান রাখা। যে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তার জন্য স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের হক ও পারিবারিক জীবনের মাসআলা সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয। মোটকথা, শরীয়তের জরুরী বিষয়গুলির হুকুম-আহকামের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরযে আইন।

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! ইল্‌মের দ্বিতীয় স্তর হল, উচ্চ পর্যায়ের ইল্‌ম। উচ্চ পর্যায়ের ইল্‌ম বলতে, সাধ্যমত কুরআন ও হাদীসের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতা হাসিল করা। এর জন্য অনেক সময় ও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ স্তরের ইল্‌ম অর্জন করা ফরযে কিফায়াহ। কুরআন মজীদে সূরা তাওবার ১২২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ
اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

" প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে কিছু লোক কেন বার হয় না, যারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান হাসিল করবে এবং যখন তারা আপন জাতির কাছে ফিরে আসবে, তখন তাদেরকে (দ্বীনের কথা শুনিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে) ভয় দেখাবে, যাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।"

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যেহেতু সবার পক্ষে শরীয়তের সমস্ত বিষয়ের গভীর জ্ঞান হাসিল করা সম্ভব নয়, তাই এটাকে গোটা উম্মতের জন্য ফরযে কিফায়াহ করা হয়েছে। সুতরাং, এলাকায় যদি শরীয়তের একজন উপযুক্ত আলিম থাকেন, তাহলে অন্যান্য মুসলিমরাও এ ফরযের দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবেন। কিন্তু যদি এলাকায় একজনও বিজ্ঞ আলিম না থাকেন, তবে তাদের মধ্য হতে কাউকে আলিম তৈরি করা অথবা

অন্য কোন জায়গা থেকে একজন আলিমকে সেই এলাকায় রাখার ব্যবস্থা করা, সমাজের উপর ফরয।

শ্রোতামণ্ডলী ! এ পর্যন্ত আমরা ইল্‌মের যে গুরুত্ব ও ফযীলত শুনেছি, যদিও তা ইল্‌মে দ্বীন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে জেনারেল শিক্ষার প্রতি অবহেলা করা যাবে না। মনে রাখবেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও আমাদের জন্য জরুরী। কেননা, এ সব শিক্ষায় দুনিয়াবী ফায়দা তো আছেই, তা ছাড়া দ্বীন প্রচার-প্রসারের জন্য এটা জরুরী। কুরআন মজীদে সূরা ইবরাহীমের ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

" আমি প্রত্যেক নবীকে তাঁর আপন জাতির ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যেন জাতির সামনে (আল্লাহর হুকুম-আহকাম) স্পষ্টভাবে পেশ করতে পারে।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, জেনারেল ও মাতৃভাষার জ্ঞান অর্জন করা দরকার। তা না হলে কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা করে মানুষের কাছে দ্বীন প্রচার করা সম্ভব হবে না।

সুনানে তিরমিযীর ২৭১৫ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করার প্রয়োজনে সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবিত রযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়াহূদীদের 'সুরয়ানী' নামক ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তিনি দু'সপ্তাহের মধ্যেই 'সুরয়ানী' ভাষা শিখেও নিয়েছিলেন। এ দ্বারা বোঝা যায়, প্রয়োজনে ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা শেখা জাইয আছে। বরং বর্তমান যুগে দ্বীন প্রচারের জন্য ইংরেজি শেখা দরকার। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইংরেজি শেখা জাইয আছে কিন্তু ইংরেজদের কালচার ধারণ করা হারাম। আমরা অনেকেই এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না ।

সুধীবৃন্দ ! আফসোসের বিষয় হল, যে জাতির ধর্ম গ্রন্থের প্রথম আয়াতে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আজ সেই জাতি পড়াশোনার ব্যাপারে গাফেল ! বর্তমান ৯০ শতাংশ মুসলিম, ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান রাখে না। আর জেনারেল শিক্ষায়ও আমরা অনেক পিছিয়ে। মনে রাখবেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মূর্খতা জাতির ক্যান্সার। শিক্ষা বিহীন কোন জাতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্যই বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইল্‌ম হাসিল করার বহু ফযীলত বর্ণনা করেছেন। সুনানে তিরমিযীর ২৬৮৫ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ উমামাহ বাহিলী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, একবার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল আবেদ (জাহেল ইবাদতকারী) আর অন্যজন ছিল আলিম। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ আবেদের উপর আলিমের মর্যাদা এতটা বেশি, যতটা আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির ওপর। এটা রসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বেশি বেশি ইল্‌ম হাসিল করা এবং সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ১৬

হাদীসে জিবরাঈল

সফর মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান
১৬ সফর ১৪৪৩ হিজরী, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ❁ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ সফর মাসের ১৬ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল "হাদীসে জিবরাঈল"। "হাদীসে জিবরাঈল" একটা হাদীসের নাম। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের প্রায় ২ মাস পূর্বে একদিন ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মানুষের রূপ ধারণ করে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসে দ্বীন সম্পর্কে ৫ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলেন। আর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। যে হাদীসের মধ্যে এই প্রশ্ন-উত্তর পর্বটি বর্ণিত আছে, সেটাকে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় "হাদীসে জিবরাঈল" বলা হয়।

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বহুবার এসেছিলেন। কতবার এসেছেন, তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা সঠিক সূত্রে কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তবে ইমাম কস্তালানী (রহ) আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ কিতাবে প্রথম খণ্ডে ২১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "জিবরাঈল

আলাইহিস সালাম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ২৪ হাজার বার এসেছিলেন।" যদিও মুহাদ্দিসগণের নিকটে এর কোন সঠিক সূত্র নাই, তবুও এদ্বারা এতটুকু প্রমাণ করা যায় যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অসংখ্যবার এসেছেন।

সহীহ মুসলিম ও মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীস। হযরত উমার (রযি) বলেছেনঃ আমরা একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ সেখানে আমাদের সামনে একব্যক্তি চলে এল। তার পোশাক ছিল সাদা ধবধবে আর মাথার চুল ছিল কালো কুচকুচে। দূর থেকে সফর করে আসার কোন চিহ্ন তার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। আবার আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চেনেও না।

মানুষটি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে নিজের হাঁটু দু'টি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে দু'হাতের তালু নিজের দু'রানের উপর রেখে (নামাযে বসার মতো) বসে গেল। তারপর বললঃ হে মুহাম্মাদ ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। ইসলাম কাকে বলে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ৫টি জিনিসের নাম হল, ইসলাম। (১) কলিমা তৈয়্যিবা'র সাক্ষ্য দেওয়া, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত দেওয়া, (৪) রমাযানের রোযা রাখা, (৫) সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা। উত্তর শুনে লোকটি বললঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। হযরত উমার (রযি) বলেছেনঃ আমরা তার কথা শুনে অবাক হচ্ছিলাম। কেননা, সে অজ্ঞ ব্যক্তির মতো প্রশ্ন করছিল আবার বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো সমর্থনও করছিল।

তারপর লোকটি প্রশ্ন করল, আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। ঈমান কাকে বলে ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ৬ টি জিনিসের উপর বিশ্বাস

স্থাপন করার নাম হল ঈমানঃ (১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, (২) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, (৩) কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, (৪) নবী ও রসূলদের প্রতি বিশ্বাস, (৫) আখিরতের প্রতি বিশ্বাস, (৬) "তাকদীর" অর্থাৎ ভাল-মন্দ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস। উত্তর শুনে লোকটি আবারও বললেনঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

তারপর লোকটি প্রশ্ন করল, আপনি আমাকে "ইহ্সান" অর্থাৎ ইখলাস সম্পর্কে বলুন। ইখলাসের সাথে ইবাদত কীভাবে করতে হয় ? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেনঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তাঁকে দেখার অনুভূতি না হয়, তাহলে অন্তত এটা অনুভব করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

এবার লোকটি বললঃ আপনি আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। কিয়ামত কবে হবে ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এব্যাপারে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু জানে না। অর্থাৎ, কিয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখ তোমার যেমন অজানা আমারও তেমন অজানা।

তখন লোকটি বললঃ তাহলে আপনি আমাকে কিয়ামতের আলামত বলে দিন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কিয়ামতের দু'টি আলামত) বলেছিলেনঃ (১) কিয়ামতের পূর্বে দেখবে, গর্ভধারিণী মা হবে দাসী আর সন্তান হবে মনিব। অর্থাৎ, সন্তান মায়ের সাথে দাসীর মতো ব্যবহার করবে। (২) কিয়ামতের পূর্বে দেখবে, এককালে যাদের পায়ে জুতো জুটত না, পরনে বস্ত্র জুটত না, যারা ছিল দরিদ্র এবং বকরী-পালের রাখাল, তারা বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করায় প্রতিযোগিতা করবে।

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত উমার (রযি) বলেনঃ এরপর লোকটি চলে গেল। কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ উমার ! তুমি জান

প্রশ্নকারী কে ছিল ? উমার (রযি) বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ উনি ছিলেন জিবরাঈল ফেরেশতা। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! এ পর্যন্ত হাদীসে জিবরাঈলের বাংলা তরজমা শেষ হল। এটা সহীহ মুসলিম ও মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীস। হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেছেনঃ এ হাদীসটিকে "উম্মুস সুন্নাহ" বলা যায়। "উম্মুস সুন্নাহ" মানে, হাদীসের জননী। যেমন সূরা ফাতিহাকে "উম্মুল কুরআন" অর্থাৎ, কুরআনের জননী বলা হয়। সূরা ফাতিহা যেমন গোটা কুরআনের সারমর্ম, তেমনি "হাদীসে জিবরাঈল" সমস্ত হাদীসের সারাংশ।

শ্রোতামণ্ডলী ! হাদীসে জিবরাঈলের ব্যাখ্যায় আমরা সর্বপ্রথম আলোচনা করব, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মানুষ রূপে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে কবে এসেছিলেন। এ সম্পর্কে সীরতে মুস্তফা নামক সীরত গ্রন্থে তৃতীয় খণ্ডে ১৫১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, হাদীসে জিবরাঈলের ঘটনাটি বিদায় হজ্জের পর ১১ হিজরীর শুরুতে (অর্থাৎ, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের প্রায় ২ মাস পূর্বে) ঘটেছিল।

বিদায় হজ্জে আরাফাতের মাঠে কুরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। সেটা ছিল সূরা মাইদার ৩ নম্বর আয়াত। আয়াতটি এইঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পছন্দ করেছি।"

সূরা মাইদার ৩ নম্বর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিদায় হজ্জ থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম উম্মতে মুসলিমা'কে দ্বীন শেখানোর জন্য মানুষ রূপে নবীজির মজলিসে এসেছিলেন এবং তাঁকে ৫টি প্রশ্ন করেছিলেন।

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রথম প্রশ্ন করছিলেন, ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদী জিনিস কী ? তার উত্তরে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫ টি আমলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সহীহ বুখারীর ৮ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে উমার (রযি) থেকে হুবহু সেই ৫টি আমলের কথা বর্ণিত আছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

"আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে ৫টি। (১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করা। (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত দেওয়া। (৪) হজ্জ করা। (৫) রমাযানে রোযা রাখা।

অতএব, আমরা যারা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি, তাদের একান্ত কর্তব্য, ইসলামের এই বুনিয়াদী জিনিসগুলিকে আঞ্জাম দেওয়া। কলিমা তৈয়্যিবা'র সাক্ষ্য প্রদান না করলে সে মুসলিম বলে পরিগণিত হবে না। আর বাদবাকি আমলগুলি তরক করলে সে হবে ফাসেক মুসলিম।

শ্রোতামণ্ডলী ! জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীজিকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করছিলেন, ঈমান কাকে বলে ? এর উত্তরে তিনি ৬টি আকীদা'র কথা বলেছিলেনঃ

১। আল্লাহর প্রতি ঈমানঃ আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল, তাঁর যাত ও সিফাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহে যেভাবে

বর্ণনা আছে, সেভাবে বিশ্বাস করা। যেমন, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারও থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নি এবং কেউ তাঁর থেকে জন্ম নেয় নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি সর্বজ্ঞানী মহা অন্নদাতা, সন্তানদাতা, বিপদ-আপদে রক্ষাকারী। তিনি সর্বশক্তিমান।

২। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানঃ ফেরেশতাদের সংখ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে সহীহ বুখারীর ৩২০৭ নম্বর হাদীসে একথা বর্ণিত আছে যে, সপ্তম আসমানের উপর একটি ঘর আছে। যাকে বাইতুল মা'মূর বলা হয়। সেটা হল ফেরেশতাদের কা'বা। প্রতিদিন সেই কা'বা ঘরে ৭০ হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে ও তাওয়াফ করে। সেখানে একবার যারা নামায ও তাওয়াফ আদায় করে, কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয় বার তারা আর ইবাদতের সুযোগ পায় না। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, ফেরেশতা অসংখ্য। তাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

৩। কিতাব সমূহের প্রতি ঈমানঃ মনে রাখবেন, কুরআন মজীদে শুধুমাত্র ৬ টি আসমানী কিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর, সহীফায়ে ইবরাহীম ও সহীফায়ে মূসা। এছাড়া আরও বহু আসমানী কিতাব আছে। যার সঠিক সংখ্যা কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। তাই ঈমান আনার ক্ষেত্রে সংখ্যায় নির্দিষ্ট না করে সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনা উচিত।

৪। নবী ও রসূলদের প্রতি ঈমানঃ এ ক্ষেত্রেও সংখ্যায় নির্দিষ্ট না করে সকল নবীর উপর ঈমান আনতে হবে। কেননা, পৃথিবীতে কত নবী এসেছেন, তার কোন সংখ্যা সহীহ সূত্রে পাওয়া যায় না। বলা হয়ঃ ২ লক্ষ ২৪ হাজার নবী এসেছেন। এটা ভিত্তিহীন কথা। কেউ কেউ বলেনঃ নবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ

২৪ হাজার। এটা যয়ীফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অথচ আকীদা'র বিষয়ে যয়ীফ হাদীস চলে না। এ জন্যই ফাতাওয়া শামী কিতাবে দ্বিতীয় খণ্ডে ২৪২ পৃষ্ঠায় লেখা আছেঃ কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে নবী আদম আলাইহি সালাম থেকে নিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর উপর ঈমান আনবে।

৫। শেষ দিবসের প্রতি ঈমানঃ বিশ্বাস করতে হবে, একদিন কিয়ামত হবে, সৃষ্টি জগৎ শেষ হবে। আল্লাহ তায়ালা সূরা রহমানের ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞ وَ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

"পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হবে আর বাকি থাকবে তোমার সম্মানিত ও দয়াময় প্রভু।" আল্লাহ তায়ালা যখন কিয়ামত কায়েম করতে চাইবেন, তখন ইসরাফীল আলাইহিস সালামকে শিংগায় ফুঁৎকার করার নির্দেশ দিবেন। তখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। দীর্ঘ ৪০ বছর পর দ্বিতীয় বার আবার শিংগায় ফুঁৎকার করার নির্দেশ দিবেন। তখন সকলে কবর থেকে উঠে হাশর মাঠে চলে আসবে। আল্লাহ তায়ালা সূরা নাযিয়াতের ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

"সেদিন প্রকম্পিত করবে প্রথম শিংগাধ্বনি। তারপর আসবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি।" সূরা নাবা'র ১৮ নম্বর আয়াতে আছেঃ

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا

"যখন (দ্বিতীয় বার) শিংগায় ফুঁৎকার করা হবে, তখন তোমরা দলে দলে (কবর থেকে হাশর মাঠে) এসে জমা হবে।"

৬। ভাল ও মন্দ ভাগ্যের প্রতি ঈমানঃ এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, ভাল ও মন্দ যা কিছু ঘটে, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত ভাগ্য অনুযায়ী হয়। সহীহ বুখারীর ৫০৭৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ " আল্লাহর কলম অনেক আগে তোমার ভবিষ্যৎ লিখে দিয়েছে।" অতএব, ভাগ্যে যা আছে, তা হবে, অবশ্যই হবে। আর ভাগ্যে যা নেই, তা হবে না, হতেই পারে না। এ বিশ্বাসের নাম হল ঈমান।

সুধীবৃন্দ ! আমরা হাদীসে জিবরাঈলের ব্যাখ্যা করছিলাম। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তৃতীয় প্রশ্ন করে বলেছিলেনঃ আপনি আমাকে "ইহ্সান" অর্থাৎ ইখলাস সম্পর্কে বলুন। ইখলাসের সাথে ইবাদত কীভাবে করতে হয় ? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেনঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তাঁকে দেখার অনুভূতি না হয়, তাহলে অন্তত এটা অনুভব করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

ইহ্সানের শাব্দিক অর্থ হল, কোন কাজ ভাল করে করা। তবে এখানে ইহ্সানের অর্থ হল, ইখলাস। অর্থাৎ, প্রতিটি ইবাদত ইখলাস ও নির্ভেজাল মনে আদায় করা। এর অপর নাম 'তাসাওউফ' বা সুফীতত্ত্ব।

তারপর সর্বশেষে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীজিকে কিয়ামতের তারিখ ও নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি কিয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখ বলেন নি। বলেছিলেন দু'টি নিদর্শন । (১) কিয়ামতের আগে সন্তানেরা মা-বাপের সাথে দাস-দাসীর মতো ব্যবহার করবে । (২) মানুষের মনে বিল্ডিং-বালাখানা তৈরী করার প্রবণতা দেখা যাবে। অর্থাৎ, যখন মানুষের ঘর-বাড়ি হবে পাকা আর ঈমান হবে কাঁচা কিংবা ফাঁকা, তখনই হবে কিয়ামত।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ১৭

হালাল-হারাম

সফর মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান
২৩ সফর ১৪৪৩ হিজরী, ১লা অক্টোবর ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ.فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী ! আজ আমি আপনাদের সামনে হালাল ও হারাম পন্থায়, ধন-সম্পদ আয় ও ব্যয় করা সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। ধন-সম্পদ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে একটি বড় নিয়ামত। তিনি আমাদের জীবন যাত্রার জন্য প্রধান বস্তু হিসাবে মাল দান করেছেন। মালের প্রয়োজনীয়তা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। কুরআন মজীদে একাধিক জায়গায় এই মাল-দৌলতকে خَيْرٌ ও فَضْل বলা হয়েছে। "খইরুন" শব্দের মানে হল, উত্তম বস্তু। আর "ফযলুন" মানে অনুগ্রহ।

মাল উত্তম বস্তু ও আল্লাহর অনুগ্রহ তখনই হবে, যখন আমরা তা হালাল পন্থায় সঞ্চয় করব। কেননা, অবৈধ ভাবে সঞ্চিত মালে বরকত হয় না। তাছাড়া, যে ব্যক্তির খাদ্য-খোরাক লেবাস-পোশাক হারাম মালের হয়, তার ইবাদত উপাসনা কবুল হয় না।

মুসনাদে আহমাদের ১৪৪৪১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ "যে রক্ত-মাংস হারাম মাল দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জাহান্নামই তার উপযুক্ত।"

সহীহ বুখারীর ৬৪২৭ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ "এই মাল হচ্ছে মিষ্টি ও মন মাতানো জিনিস। যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে মাল সংগ্রহ করে ন্যায় পথে খরচ করে, সেই মাল তার জন্য কতই না সুন্দর উপকারী জিনিস।"

আজ সমাজের বহু মানুষ হালাল-হারামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা কেবল মাল-দৌলতই চেনে। অথচ কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় হারাম পন্থা বর্জন করে হালাল পন্থায় মাল সংগ্রহ করার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যারা হারাম মাল বর্জন করে না, তাদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে সূরা নিসা'র ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"হে ঈমানদারগণ তোমরা একে অপরের মাল অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি খুবই দয়ালু।" এ আয়াতে অপরের মাল অন্যায় ভাবে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কেবল খাওয়াটাই নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং আয়াতে বলা উদ্দেশ্য হল, কারও মাল অবৈধ ভাবে ভোগ করো না। সেটা খাওয়ার মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কোন রকমে হোক। যেমন, সুদ, ঘুষ, জুয়া, পরের সম্পদ জবর-দখল করা প্রভৃতি পন্থা।

সুধীবৃন্দ ! আমাদের সমাজে ধন-সম্পদ হাসিল করার কয়েকটি হারাম পন্থা আছে। যেমন, সুদ খাওয়াঃ সহীহ মুসলিমের ১৪৫ নম্বর হাদীসে সাতটি বড় কবীরাহ গোনাহের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি হল, সুদ খাওয়া। সুদখোরের প্রতি আল্লাহ দুনিয়া ও পরকালে রাগান্বিত থাকেন। সুদখোর এমন অভিশপ্ত যে, তাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে আহ্বান করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের সূরা বাকারার ২৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "তোমরা যদি সুদের কারবার বন্ধ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেনঃ আমাদের শরীয়তে কেবল দু'জন মহাপাপী এমন আছে, যাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। একজন হল সুদখোর। যার বিরুদ্ধে সূরা বাকারার ২৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলীর সাথে দুশমনী করে। সহীহ বুখারীর ৬৫০২ নম্বর হাদীসে আবূ হুরায়রাহ (রযি) বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ أٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে দুশমনী করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।"

সহীহ বুখারীর ১৫৯৮ নম্বর হাদীসে জাবির (রযি) হতে বর্ণিত আছে- সুদখোর, সুদ দাতা, যে ব্যক্তি সুদের লেনদেন লেখে এবং যারা এর সাক্ষী থাকে, সকলের উপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন।

মুসনাদে আহমাদের ৮৬৪০ নম্বর হাদীসে আবূ হুরায়রাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ "আমি মি'রাজের রজনীতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম, যাদের পেট ছিল ঘরের মতো বড়। তাদের পেটের ভিতরে ছিল বহু সাপ। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা ? তিনি উত্তর দিলেন, এরা হচ্ছে সুদখোর !" এ দ্বারা আমরা সুদখোরের পরিণাম যে কতো ভয়াবাহ তা সহজেই অনুমান করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সুদ থেকে হিফাযত করুন।

সুধীবৃন্দ ! ধন-সম্পদ হাসিল করার আর একটি হারাম পন্থা হল, ঘুষ খাওয়াঃ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ "ঘুষখোর ও ঘুষ দাতা, উভয় ব্যক্তির উপর আল্লাহর লা'নত হোক।" এটা মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের ১৪৬৬৯ নম্বর হাদীস। মু'জামে আওসাতের ২০২৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঘুষ নেয় আর যে দেয়, তারা উভয়ে জাহান্নামী।

অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, আজ আমাদের সমাজে ঘুষের প্রচলন ব্যাপক হয়ে গেছে। অফিস আদালত থেকে শুরু করে সব জায়গায় ঘুষের মহড়া চলছে। ঘুষখোরের কোন ধর্ম থাকে না। আর না থাকে আইন-কানুনের কোন মূল্য। ঘুষখোর অর্থের লোভে সবকিছু করতে পারে। তাই ঘুষ খাওয়া চরম পর্যায়ের অপরাধ।

শ্রোতামণ্ডলী ! ধন-সম্পদ হাসিল করার আর একটি হারাম পন্থা হল, জুয়া খেলাঃ শরীয়তে জুয়া খেলার মাধ্যমে অর্থ ইনকাম করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সূরা মাইদা'র ৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে ঈমানদারেরা ! মদ, জুয়া, প্রতিমা পূজা ও লটারি কাটা নাপাক ও শয়তানী কাজ ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং, তোমরা এসব বর্জন করো। নিশ্চয় তোমরা সফলকাম হবে।"

আমরা গভীর ভাবে লক্ষ্য করি, এ আয়াতে মদ, জুয়া, প্রতিমা পূজা ও লটারি কাটা, এই ৪টি মহাপাপকে এক সাথে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এগুলি নোংরা ও শয়তানী কাজ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এসব কবীরাহ গোনাহ থেকে হিফাযত করুন।

এখানে একটি কবীরাহ গোনাহর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটা হল, লটারি কাটাঃ বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজ লটারির গোনাহে গ্রেপ্তার হয়ে আছে। বিনা পরিশ্রমে রাতারাতি লাখপতি হওয়ার নেশায় বহু যুবক লটারি কেটে থাকে। অথচ কুরআন মজীদের ভাষায় এটা হল নাপাক ও শয়তানী কাজ। মনে রাখবেন, সুদ ও ঘুষের টাকা যেমন হারাম, তেমনি লটারিতে পাওয়া টাকাও হারাম।

ধন-সম্পদ হাসিল করার আর একটি হারাম পন্থা হল, অবৈধ ভাবে পরের জমি-জায়গা ভোগ-দখল করা। সহীহ মুসলিমের ৪০২৪ নম্বর হাদীসে সাহাবী সাঈদ ইবনে যায়েদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ

مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ

"যে কেউ বলপূর্বক অন্যায় ভাবে কারও এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার গলায় সাত স্তর যমীন হার রূপে পরিয়ে দিবেন।" অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সাত জমিনের ভার তার উপর চাপিয়ে দিবেন। কেননা, সে গায়ের জোরে বলপূর্বক জমি দখল করেছে।

(রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

"সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সঙ্গী-সাথী হবে।" সুতরাং যে সমস্ত ব্যবসায়ী নামায কালামের পাবন্দি করে আর মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তারা এই মহা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, ইনশা আল্লাহ। পক্ষান্তরে যারা মিথ্যা কথা বলে মানুষকে ঠকায়, তাদের সম্পর্কে সুনানে ইবনে মাজা'র ২১৪৬ নম্বর হাদীসে সাহাবী রিফাআহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ

إِنَّ التُّجَارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَ بَرَّ وَ صَدَقَ

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের পাপিষ্ঠ অবস্থায় উঠানো হবে। তবে যারা ন্যায় ও সত্য কথা বলেছে, তারা হবে ব্যতিক্রম।" পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার ও হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন ।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বলেছেনঃ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমরা কেউ যদি কোন পাপকাজ হতে দেখ, তাহলে সম্ভব হলে সে যেন নিজের হাত দ্বারা তার প্রতিরোধ করে। হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে সে যেন যবান দ্বারা প্রতিবাদ করে। আর যদি যবান দ্বারা প্রতিবাদ না করতে পারে, তাহলে সে যেন নিজের অন্তর দ্বারা সেটাকে ঘৃণা করে। এটা হল ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।"

বেশিরভাগ দেখা যায়, আমরা যারা অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে আপ্রাণ বেঁচে থাকি, তারা অন্যান্যদের গোনাহ করতে দেখে মনে করে থাকি, যারা গোনাহ করছে সাজা তারাই পাবে, আমাদের তাতে কী ? মনে রাখবেন, গোনাহ হতে দেখে এভাবে উদাসীন থাকার কারণেই আজ আমাদের মুসলিম সমাজের এই ভরাডুবি অবস্থা।

সহীহ বুখারীর ২৪৯৩ নম্বর হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম-আহকামের পাবন্দী করে আর যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত থাকে, উভয়ের দৃষ্টান্ত সেই দু'তলা জাহাজের যাত্রীদের মতো, যারা লটারির মাধ্যমে বসার সিট নির্ধারণ করে নিল। তাদের মধ্যে কেউ সিট পেল উপর তলায় আর কেউ নীচের তলায়। নীচের তলার লোকেরা পানি আনার জন্য উপর তলায় যায়। যার কারণে উপর তলার লোকেরা কষ্ট পায়। তাই নীচের তলার লোকেরা ভাবল, আমরা যদি উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে নীচের তলায় জাহাজের নীচে একটা ছিদ্র করে নিই, তাহলে ভাল হয়। এই ভেবে তারা জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লাগল। তখন যদি উপর তলার যাত্রীরা নীচের তলার যাত্রীদেরকে বাধা না দেয়, তাহলে সকলেই ধ্বংস হবে। আর যদি এরা ওদেরকে বাধা দেয়,

তাহলে সকলেই রক্ষা পাবে। এটা সহীহ বুখারীর ২৪৯৩ নম্বর হাদীস। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সৎ মানুষেরা যদি অসৎ মানুষদেরকে গোনাহ থেকে নিষেধ না করে, তাহলে গোনা'র কারণে আল্লাহর গযব নাযিল হলে ভালো ও মন্দ উভয় রকম মানুষ সেই গযবে গ্রেপ্তার হবে।

ইদানিং একটি সংবাদ-পত্রে খবর ছাপা হয়েছে যে, আমাদের পশ্চিম বাংলার কোন এক জায়গার কিছু মা-বোনেরা সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে কান্নাকাটি করে এই বলে অভিযোগ জানিয়েছে যে, তাদের স্বামীরা মদ, জুয়া ও লটারিতে ধন সম্পদ নষ্ট করে সোনার সংসার ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই তারা বর্তমান সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে যে, অবিলম্বে এগুলিকে নিষিদ্ধ করা হোক। এ দ্বারা বোঝা যায়, ইসলাম ছাড়া কোন গতি নেই। ইসলামের বিধি-বিধান না মানলে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি আসতেই পারে না।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, বর্তমান আমাদের সমাজে সবরকম গোনা'র পরিবেশ ছেয়ে গেছে। এখন আমাদের একান্ত কর্তব্য হল, নিজেরা এসব গোনাহ থেকে বিরত থাকা ও সমাজকে এসব গোনাহ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা করা। আমরা গত জুমুআয় সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি ও জমি-জায়গা জবরদখল-- এই ৪টি কবীরা গোনাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আজ বিশেষ করে মদ, যেনা-ব্যাভিচার, গান-বাজনা ও মোবাইলের ফিতনা-- এই ৪টি গোনাহ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

(১) মদ পান করাঃ ইসলাম ধর্মে মদ পান করা হারাম। তবুও আমরা দেখছি, বর্তমান মুসলিম সমাজে মদ পান করা প্রচুর বেড়ে গেছে। কোন কোন জায়গার রিপোর্টে দেখা

গেছে, মুসলিমরা অমুসলিমদের চেয়ে বেশি পরিমাণে মদ পান করে। এটা আমাদের দূর্ভাগ্যতা।

মনে রাখবেন, ব্যাপকহারে মদ পান করা কিয়ামতের একটি আলামত। সহীহ বুখারীর ৮০ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস ইবনু মালিক (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَثْبُتَ الجَهْلُ وَيُشْرَبَ الخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا

"কিয়ামতের আলামত হল, ইল্‌ম উঠে যাবে, মূর্খতা ছেয়ে যাবে, ব্যাপকহারে মদ পান করা হবে আর ব্যাপকভাবে যেনা-ব্যাভিচার হবে।"

সুনানে দারাকুত্‌নীর ৪৬১০ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র (রযি) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلْخَمْرُ اُمُّ الْخَبَائِثِ "মদ হল যাবতীয় পাপের জনক।" মদ পানকারী, মাতাল হয়ে নিজের পরিবারের বিবি-বাচ্চাদেরকে মারধর ও গালি-গালাজ করা থেকে শুরু করে গুন্ডাগিরি, যুলুম-অত্যাচার, যেনা-ব্যভিচার, সতী নারীদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ও সম্পদ নষ্ট করা এমনকি খুনখারাবি করতেও পিছপা হয় না। মোটকথা, মদ পানকারী মানুষ আর মানুষ থাকে না। বরং সে হয়ে ওঠে মানবরূপে একটা হিংস্র পশু। তাই সে সবরকম পাশবিক আচরণ করে থাকে। এজন্যই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلْخَمْرُ اُمُّ الْخَبَائِثِ "মদ হল যাবতীয় পাপের জনক।" আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে মদ পান করা থেকে হিফাযত করুন।

(২) যেনা-ব্যভিচারঃ যেনা-ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত ও অশ্লীল কাজ। এটা চরম পর্যায়ের একটি সামাজিক অপরাধ। একজন রুচিশীল সভ্যমানুষ কখনই এটাকে মেনে নিতে পারে না। নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং বংশ পরিচয়ের হিফাযত করার

জন্য ইসলাম ধর্মে যেনা-ব্যভিচার হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيلًا

"তোমরা যেনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।" এখানে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন শুধু যেনা করতে নিষেধ করেন নি, বরং তিনি যেনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। যেনার ধারে কাছে না যাওয়া বলতে যে সমস্ত জিনিস যেনা-ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করে সেগুলিকে বর্জন করা। যেমন বেগানা নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া, তাদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা, অশ্লীল ফিল্ম দেখা, প্রভৃতি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হিফাযত করুন।

(৩) গান-বাজনাঃ গান-বাজনা মানুষকে দুনিয়ার রঙ-তামাশায় মত্ত করে রাখে এবং আখেরাত থেকে গাফিল করে দেয়। তাই ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। সুনানে আবূ দাউদের ৪৯২৭ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ "গান-বাজনা অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।" সুনানে ইবনে মাজার ৪০২০ নম্বর হাদীসে লেখা আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের একশ্রেণির মানুষ মদের ভাল ভাল নাম রেখে মদ পান করবে আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্রে গায়িকা নারীদের গান-বাজনা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেবেন। আর তাদের মধ্যে কিছু মানুষকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দেবেন। এটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে গান-বাজনা থেকে হিফাযত করুন।

(৪) মোবাইলের ফিতনাঃ মোবাইলের ফিতনা হল, এযুগের সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের একাধিক জায়গায় বলেছেনঃ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ "তোমরা শয়তানের রাস্তাসমূহকে অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" বর্তমান যুগে শয়তানের প্রায় সমস্ত রাস্তা মোবাইলের মধ্যে এসে গেছে। অতএব, আমরা মোবাইলের অপব্যবহার থেকে সাবধান হয়ে যাই। খেয়াল করে শুনবেন, আমি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে নিষেধ করছি না। বরং এর অপব্যবহার থেকে সাবধান করছি।

মোবাইলের অপব্যবহার বলতে উদাহরণ স্বরূপ, মোবাইলে সময় অপচয় করা, যুবকদের বিভিন্ন রকম গেম খেলায় মেতে ওঠা, বাড়িতে মেয়েদের হাতে স্মার্ট ফোন তুলে দেওয়া, প্রভৃতি। নিশ্চয় আপনারা সকলে মোবাইলের এসব সর্বনাশা কর্মকাণ্ড তিলে তিলে উপলব্ধি করছেন। এছাড়া অশ্লীল ভিডিও দেখা, গান-বাজনা শোনা, বেগানা নারীর সাথে কথা বলা, প্রভৃতি অসংখ্য হারাম কাজের পথ খুলে গেছে এই মোবাইলের মাধ্যমে। এটাই হল, মোবাইলের অপব্যবহার। আর এই মোবাইলের কারণে বিশেষ করে ব্যভিচার ও মিথ্যা বলা যে হারে বেড়ে গেছে, তা আদৌ বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরিশেষে, মোবাইল সম্পর্কে একটি বিশেষ কথা বলে রাখি। সেটা হল, ছোট্ট বাচ্চাদের হাতে কার্টুন ইত্যাদি দেখার জন্য মোবাইল দেওয়া একটি চরম পর্যায়ের মূর্খামি। অনেক বাড়িতে এমনও দেখা যায় যে, ছোট্ট বাচ্চার হাতে মোবাইল না দিলে ভাত খায় না। এটা সন্তান লালন-পালনের একটি মারাত্মক ভুল পদ্ধতি। এভাবে খাবারের সাথে সন্তানের মস্তিষ্কে মোবাইলের যাবতীয় কুপ্রভাব ছেয়ে যায়, তা আমরা কেউই ভাবি না।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গবেষক মহল থেকে একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, যদি বর্তমান সমাজে শিশু ও যুবকদের মধ্যে

মোবাইলের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রনে না আসে, তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম মানসিক দিক দিয়ে পঙ্গু এবং স্বাস্থ্য ও আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! মোবাইল সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী মাসআলা অবশ্যই মনে রাখবেন। (১) মোবাইলে কথা বলার সময় প্রথমে সালাম না দিয়ে 'হ্যালো' বলা সুন্নতের খেলাফ এবং অমুসলিমদের রীতি। অতএব, এটা অবশ্যই বর্জনীয়। (২) মোবাইলের রিংটনে গান-বাজনা লাগিয়ে রাখা হারাম। (৩) মোবাইলে কোন অবৈধ বিষয় শেয়ার করা নাজাইয। এরূপ নাজাইয জিনিস শেয়ার করলে, তারপর যতজন গোনাহ করবে তাদের সকলের পাপের ভাগিদার হতে হবে। কেননা, সহীহ বুখারীর ৭৩২১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে তার পাপের একভাগ আদম আলাইহিস সালামের (কাবিল নামক) প্রথম পুত্রের পাওনা হয়। কেননা, সে-ই সর্বপ্রথম মানুষ হত্যার রীতি চালু করেছিল। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কোন অন্যায়ের পথ দেখালে পরবর্তী সকলের পাপের ভাগিদার হতে হবে। অতএব, আমরা সকলে বিশেষ করে মোবাইলে নাজাইয ভিডিও শেয়ার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকব।

দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সবরকম গোনাহ থেকে হিফাযত করুন এবং মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ১৯

বিশ্বনবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

রবীউল আওয়ালের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান
৮ রবীউল আওয়াল ১৪৪৩ হিজরী, ১৫ অক্টোবর ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ❁ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউল আওয়াল মাসের ৮ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। এটা বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণের মাস। অতএব, আজ আমরা তাঁর জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের বয়স ছিল ৯৬০ বছর। নবী আদম আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের ১২০০ বছর পর নূহ আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে এসেছিলেন। নূহ আলাইহিস সালামের ১১৪২ বছর পর এসেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ৫৬৫ বছর পর মূসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ৫৬৯ বছর পর দাঊদ আলাইহিস সালাম আর দাঊদ আলাইহিস সালামের ১৩৫৬ বছর পর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ৬০০ বছর পর আমাদের নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব, এই হিসাব অনুযায়ী, আদম আলাইহিস সালামের পৃথিবীতে আগমনের ৬৩৯২ বছর পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। তারিখে ইবনে আসাকির কিতাবে প্রথম খণ্ডে ১৯ পৃষ্ঠায় এ কথা লেখা আছে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ সালে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে ও কোন্ দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে, ৫৭০ সালে যে বছর আবরাহা বাদশাহ কা'বাঘরের উপর আক্রমণ করেছিল, সেই বছর রবীউল আওয়াল মাসের সোমবারের দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ মত হল, সেটা ছিল রবীউল আওয়ালের ১২ তারিখে সুবহে সাদিকের সময়। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ "হে নবী ! আমি আপনাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত রূপেই পাঠিয়েছি।"

সুধীবৃন্দ ! যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন বিশ্বে একাধিক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। যেমন, পারস্যের সম্রাট কিসরার অট্টালিকার চৌদ্দটি চুড়া ধসে পড়ে। পারস্যের আগুনপূজারীদের অগ্নিকুণ্ডের যে আগুন হাজার বছর ধরে জ্বলছিল, তা নিভে যায়। এ মু'জিযার মধ্যে ইঙ্গিত ছিল যে, বিশ্বনবীর শুভাগমনের পর সব রকম শির্ক ও কুসংস্কার দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে আর তখনকার সুপ্রীম পাওয়ার রোম ও পারস্যের রাজত্ব শেষ হবে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা আব্দুল্লাহকে দাদা আব্দুল মুত্তালিব খেজুর আনার জন্য মদীনায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এভাবে জন্মের পূর্বেই তিনি হয়েছিলেন ইয়াতীম। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন দাদা আব্দুল মত্তালিব তাঁকে কাবা ঘরে নিয়ে যান এবং সেখানে দুআ করার পর ঘরে নিয়ে আসেন। সাত দিনের মাথায় আকীকা করে কুরাইশদের দাওয়াত দেন। তারা জিজ্ঞেস করেছিল, শিশুর নাম কী রেখেছেন? আব্দুল

মুত্তালিব উত্তরে বলেছিলেনঃ এর নাম রেখেছি মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ হল প্রশংসিত। কুরাইশদের কাছে এই নামটি ছিল একবারে নতুন। তারা সাধারণত কোন না কোন দেব দেবীর নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখত। তাই তারা আব্দুল মুত্তালিবকে এমন নাম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ আমার নাতি বিশ্বজগতের প্রশংসার পাত্র হোক এই উদ্দেশ্যে আমি এ নাম রেখেছি।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'মুহাম্মাদ' নামটি রেখেছিলেন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব। আর সূরা 'সফ্ফ'-এর ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম বলেছেন 'আহমাদ'। আহমাদ মানে, চরম প্রসংশাকারী। তিনি আল্লাহ তায়ালার চরম প্রশংসা জ্ঞাপন করবেন, তাই তাঁকে 'আহমাদ' বলা হয়েছে।

জন্মগ্রহণের পর সর্ব প্রথম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা আমিনার দুধপান করেছিলেন। কিছুদিন পর আবূ লাহাবের দাসী সুওয়াইবা দুধপান করিয়েছিলেন। তারপর হালীমাহ সা'দিয়া এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মা হালীমার কাছে নবীজী চার বছর ছিলেন। ছ'মাস অন্তর তিনি তাঁকে মা আমিনার কাছে নিয়ে আসতেন। চার বছর বয়সে তিনি হালীমার কাছ থেকে মা আমিনার কাছে ফিরে আসেন।

নবীজির বয়স যখন ৬ বছর, তখন মা আমিনা তাঁকে নিয়ে মদীনায় গিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নানার বাড়ী ছিল মদীনায়। কোন কোন বর্ণানায় আছে, মা আমিনা নিজের স্বামীর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গিয়েছিলেন। মদীনা থেকে ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। আর সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত 'উম্মে আয়মান' এই সফরে মা আমিনার সাথে ছিলেন। তিনি নবীজিকে মক্কায় নিয়ে

আসেন। নবীজি মক্কায় এসে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তারপর তাঁর ৮ বছর বয়সে দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইন্তিকাল করেন।

আব্দুল মুত্তালিবের ১০ ছেলে ও ৬ মেয়ে ছিল। অতএব, বলা যায়, নবীজির চাচা ছিলেন ৯ জন আর ফুপু ছিলেন ৬ জন। দাদার ইন্তিকালের পর চাচা আবূ তালিব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লালন পালনের দায়িত্ব নেন।

যখন তাঁর বয়স ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন, তখন আবূ তালিব নবীজিকে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পথে যখন 'তায়মা' নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন, তখন 'বুহায়রা' (নামক একজন ইয়াহুদী বড় আলিম) আবূ তালিবকে নবীজির সম্পর্কে বলেছিলেনঃ আপনি এই বাচ্চাকে যদি শাম দেশে নিয়ে যান, তাহলে ইয়াহুদীরা তাঁকে মেরে ফেলবে। কেননা, ইনি আল্লাহর শেষনবী। আমি তাওরাতে আখিরী যামানার নবীর যে সমস্ত গুণাবলীর কথা পড়েছি, সবই এই বাচ্চার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ইয়াহুদী আলিমের কথা শুনে আবূ তালিব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২৫ বছর বয়সে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদীজা রযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে নবীজির ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ মেয়ের নাম ছিল যয়নাব, ফাতিমা, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম। নবীজির সন্তানদের মধ্যে হযরত যয়নাব ছিলেন সবার বড়। ২ ছেলের নাম ছিল কাসিম ও তাহির। আর নবীজির তৃতীয় একটি পুত্র সন্তান ছিল। তাঁর নাম ইবরাহীম। তিনি মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে পয়দা হয়ে ছিলেন।

সুধীবৃন্দ ! নবী সল্লাল্লাহু আলাআইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কুরাইশরা কা'বা শরীফ পুনরায় নির্মাণ

করেছিল। সে সময় হাজারে আসওয়াদকে উঠিয়ে তার আসল জায়গায় রাখার বিষয়ে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দিয়েছিল। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এমন সুন্দর ফয়সালা করেছিলেন যে, তাতে সকলে একমত হয়ে গিয়েছিল। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে নিজ হাতে তার উপরে হাজারে আসওয়াদটি রেখে বলেছিলেনঃ প্রত্যেক গোত্রের এক জন মানুষ চাদর ধরুন। তারপর পাথরটি যখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে পাথরটি উঠিয়ে সেখানে রাখলেন। ইবনে হিশাম (রহ) এই ঘটনাটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন, নবুওতের আগে থেকেই কুরাইশ বংশের লোকেরা সকলে তাঁকে 'আল-আমীন' বলে ডাকতেন। 'আল-আমীন' মানে, আমানতদার।

নবীজি ৪০ বছর বয়সে নবুওয়ত পান। তিনি যেমন রবীউল আওয়াল মাসে সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন অনুরূপ ভাবে, এই রবীউল আওয়াল মাসের সোমবারে নবুওয়ত লাভ করেন।

নবুওয়তের দশম বছরের শাওয়াল মাসে নবীজির বয়স যখন ৫০ বছর, তখন চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু হয়। এর তিন দিন পর হযরত খাদীজা রযিয়াল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন। এ জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছরটির নাম রেখেছিলেন 'আমুল হুয্ন' দুঃখের বছর। তারপর মক্কায় কেটে যায় আরও ৩ বছর। অবশেষে, ৫৩ বছর বয়সে তিনি মদীনায় হিজরত করেন।

শ্রোতামণ্ডলী ! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনার জীবনটি ছিল ইসলামের বহিঃপ্রকাশের যুগ। তিনি মদীনায় পৌঁছে মানুষের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছানোর কাজে মশগুল হন। সুনানে ইবনে মাজা'র ৩২৫১ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, মদীনার ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড়

আলিম আব্দুলাহ ইবনে সালাম বলেনঃ আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এলে লোকেরা তাঁকে দেখার জন্যে ভীড় জমায় এবং বলাবলি করে যে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গেছেন। আমিও লোকদের সাথে তাঁকে দেখতে গেলাম। আমি তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম যে, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি দেখলাম, তিনি সর্বপ্রথম যে কথা বললেন তা হলঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

"হে লোক সকল ! তোমরা একে অপরকে খুব সালাম কর, ক্ষুধার্তকে খেতে দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখ, এবং রাতের বেলা মানুষেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায পড়। তাহলে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে এভাবে মানুষদেরকে হিদায়েতের বাণী শোনাতে থাকেন।

সুধীবৃন্দ ! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে ৪টি উমরাহ ও একটি হজ্জ করেছেন। যাকে 'হজ্জাতুল অদা' বা বিদায় হজ্জ বলা হয়। তিনি দশম হিজরীর যুল ক'দাহ মাসের ২৫ তারিখে সোমবারের দিন হজ্জ করার জন্যে মক্কা রওনা হয়েছিলেন। যুল হিজ্জাহ মাসের ৪ তারিখে সোমবারে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। হজ্জ থেকে ফারেগ হয়ে ১০ দিন মক্কায় অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় ফিরে আসার দু'মাস পর (১১ হিজরীর ২৮ শে সফর বুধবার রাতে) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার 'বাকী' নামক কবরস্থান যিয়ারতের জন্য তশরীফ নিয়ে যান। সেখানে থেকে ফিরে আসার পর তাঁর মাথা ব্যাথা শুরু হয় এবং জ্বর আসে। এই জ্বর একটানা ১৩ দিন পর্যন্ত ছিল। এ সময় তিনি নিয়ম অনুযায়ী পালাক্রমে স্ত্রীদের কাছে থাকতেন। কিন্তু যখন রোগ

বেড়ে যায়, তখন তিনি সকলের অনুমতি নিয়ে বাকি দিনগুলি হযরত আইশা রযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে কাটিয়েছিলেন।

তিনি ওফাতের ৪ দিন আগে বৃহস্পতিবার সাহাবাদেরকে মাগরিবের নামায পড়িয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁর ইমামতির শেষ নামায। সহীহ বুখারীর ৪৪২৯ নম্বর হাদীসে হযরত উম্মে ফযল (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ান এবং এতে তিনি সূরা 'মুরসালাত' তিলাওয়াত করেছিলেন। তারপর তিনি আর কোন নামায পড়াননি। এভাবে তাঁর ওফাত হয়ে যায়।

নবীজির অসুস্থতার দিনগুলিতে হযরত আবূ বকর রযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে সাহাবাদের ইমামত করে নামায পড়াতেন। সে সময় তিনি মোট ২১ ওয়াক্ত নামায পড়িয়েছিলেন। রবীউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবারের দিন দুপুর বেলা আইশা রযিয়াল্লাহু আনহা'র ঘরে নবীজির ওফাত হয়। হযরত আলী (রযি) তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। গোসলের পর ইয়ামান প্রদেশের 'সাহূল' নামক জায়গার তৈরী করা ৩টি কাপড়ে তাঁকে কাফন দেওয়া হয়েছিল।

সীরাতে ইবনে হিশাম কিতাবের কাফন-দাফন অধ্যায়ে লেখা আছে, মঙ্গলবারের দিন কাফন পরানোর পর তাঁর জানাযা কবরের পাশে রেখে দেওয়া হয়। সাহাবাদের এক একটি দল উম্মুল মু'মিনীন আইশা রযিয়াল্লাহু আনহার হুজরা মুবারকে এসে একাকী ভাবে জানাযা নামায আদায় করে চলে যেতেন। তাঁর জানাযায় নির্দিষ্টরূপে কেউ ইমামত করেননি। আসলে বড় একটি জামাআত করে নবীজির জানাযা নামায হয়নি। সকলে যে যার মতো আলাদা আলাদা একাকী ভাবে জানাযা নামায পড়েছিলেন। অধিকাংশ উলামার মতে বুধবার রাতে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। জামাই আলী, চাচা আব্বাস ও তাঁর দুই ছেলে ফযল

এবং কুছাম (রযিয়াল্লাহু আনহুম) নবীজির লাশ মুবারক কবরে নামিয়েছিলেন।

দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজের হাবীবকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। আর আমাদের সকলকে নবীজির সুন্নতের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ২০

নবীজির নবী হওয়ার ৪টি দলীল

রবীউল আউয়ালের তৃতীয় জুমুআর বয়ান
১৫ রবীউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরী, ২২ অক্টোবর ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا** ❁ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম দ্বীনদার ভায়েরা ! আজ পবিত্র রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। এই পবিত্র মাসেই বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম এবং এমাসেই তাঁর ওফাত। আমরা গত জুমুআয় তাঁর জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। আজ আমরা আলোচনা করব

বিশ্বনবীর নবী হওয়ার ৪টি দলীল সম্পর্কে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা আহ্যাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সব কিছুই জানেন।" এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দু'টি কথা বলেছেন। (১) তিনি হলেন আল্লাহর রসূল। (২) তিনি হলেন সর্বশেষ নবী।

মনে রাখবেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর দুনিয়াতে আর কোন নতুন নবী আসবেন না। একথা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, যারা তাঁর শেষ নবী হওয়াকে বিশ্বাস করবে না, তারা হবে যিন্দীক, বেঈমান ও অমুসলিম। আমরা অনেকে জানি, কয়েক বছর আগে আমাদের ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নামে এক ব্যক্তি নিজেকে নবী হওয়ার দাবি করেছিল। বর্তমানে তার বেশকিছু অনুসারীও আছে। যারা নিজেদেরকে আহমাদী মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। মনে রাখবেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সমস্ত উলামায়ে কিরামগণ এ বিষয়ে একমত যে, তারা হল অমুসলিম। অতএব, তাদের সাথে বিয়ে-শাদী করা হারাম। তাদের জানাযা নামায পড়া নাজাইয। তাদেরকে আমাদের কবরস্থানে দাফন করাও নিষিদ্ধ।

সুধী ভাইসকল ! সূরা আহ্যাবের ৪০ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রসূল বলেছেন। এখন প্রশ্ন হল, তিনি যে আল্লাহর রসূল ও নবী, তা আমরা কীভাবে বুঝব ? এর জওয়াবে মনে রাখবেন, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী

হওয়ার ৪টি দলীল রয়েছে। তাঁর নবী হওয়ার প্রথম দলীল হল, তাঁর আখলাক-চরিত্র। দ্বিতীয় দলীল হল, তাঁর তা'লীম অর্থাৎ শিক্ষা। তৃতীয় দলীল হল, তাঁর মু'জিযা অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা সমূহ। চতুর্থ দলীল হল, তাঁর সাহাবীগণ। এই ৪টি বিষয় হল তাঁর নবী হওয়ার অকাট্ট প্রমাণ। আমরা এখন এই ৪টি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করছি।

বিশ্বনবীর নবী হওয়ার প্রথম দলীল হল, তাঁর আখলাক-চরিত্র। নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা কলমের ৪ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "হে নবী ! নিশ্চয় আপনি মহান আদর্শের অধিকারী।" শুধু তাই নয়, এ পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমণের উদ্দেশ্য হল, বিশ্বকে পরিপূর্ণ রূপে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। মুওয়াত্তা মালিকের একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ "নিশ্চয় আমাকে পাঠানো হয়েছে উত্তম আদর্শ সমূহকে পরিপূর্ণ করার জন্য।" এ জন্যই তাঁর সুন্দর আদর্শের কোন তুলনাই হয় না। তাঁর উন্নত আদর্শের একটি নমুনা লক্ষ্য করুনঃ

সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত আছে, চতুর্থ হিজরীতে কোন এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একটি বাবলা গাছের নীচে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্রাম করছিলেন। নবীজির তলোয়ারটি গাছের ডালে ঝোলানো ছিল। আচমকা এক মুশ্‌রিক এসে তলোয়ারটি হাতে নিয়ে বললঃ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ হে মুহাম্মাদ! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে ? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ ! নবীজির মুখে 'আল্লাহ' শব্দটি শুনে মুশ্‌রিকের হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। এবার

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তলোয়ারটিকে হাতে নিয়ে বললেন ؟ وَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ এবার তোমাকে আমার থেকে কে বাঁচাবে বল ? লোকটি বললঃ তোমার পক্ষ থেকে আমি সদ্ব্যবহারের আশা রাখছি। তুমি আমাকে ক্ষমা দরে দাও। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইওহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বললেনঃ তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল ? লোকটি বললঃ না। তারপর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। তাকে আর কিছুই বললেন না। তারপর লোকটি যখন নিজের গোত্রে ফিরে গেল তখন সকলকে বললঃ আমি একজন শ্রেষ্ঠমানুষের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। এই বলে সে মানুষের মাঝে নবীজির খুব প্রশংসা করতে লাগল। তারপর সে নিজের বংশের সকলকে সঙ্গে নিয়ে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

শ্রোতামণ্ডলী ! দুনিয়ার কোন নেতা-মন্ত্রী যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, তাহলে তিনি কেমন ব্যবহার করতেন ? এটাই হল ভাবার বিষয়। নিজের হত্যাকারী শত্রুকে দুনিয়ার কোন মানুষ এভাবে ক্ষমা করে দেয় না। অথচ বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ ব্যক্তিকে কোন রকম প্রতিশোধ না নিয়ে ছেড়ে দিলেন। এটাই ছিল বিশ্বনবীর মহান আদর্শ। এরূপ মহান আদর্শই হচ্ছে তাঁর নবী হওয়ার প্রথম দলীল।

অনুরূপভাবে, মক্কা বিজয়ের সময় ক্ষমার যে আদর্শ তিনি দেখিয়েছেন, তার উদাহরণ গোটা জগতের মাঝে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এরূপ অপূর্ব আদর্শই হল তাঁর নবী হওয়ার প্রথম প্রমাণ।

বিশ্বনবীর নবী হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হল, তাঁর তা'লীম অর্থাৎ শিক্ষা। তিনি ছিলেন সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যেমন রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন বানিয়েছেন,

তেমনি ভাবে তাঁকে মহাশিক্ষাগুরু করে পাঠিয়েছেন। সুনানে ইবনে মাজা'র ২২৯ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমাকে শিক্ষাগুরু রূপেই পাঠানো হয়েছে।"

জানা দরকার, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি হাদীস তাঁর নবী হওয়ার পরিচয় বহন করে। তাঁর প্রত্যেকটি বাণীর মধ্যে রয়েছে হিদায়েত ও দুনিয়া-আখিরতের কামিয়াবী।

উদাহরণ স্বরূপ, একটি হাদীস লক্ষ্য করি। সহীহ বুখারীর ১২ নম্বর হাদীস। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ একসময় কোন এক ব্যক্তি এসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল ! أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ ইসলামের কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

تُطْعِمُ الطَعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"তুমি মানুষকে খানা খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করবে।" লক্ষ্য করুন, তিনি বলেছেনঃ ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল (১) ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো। এখানে তিনি জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কোন পার্থক্য না করে ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াতে বলেছেন। (২) তিনি পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করতে বলেছেন। সালাম একটি আরবী শব্দ। যার মানে অফুরন্ত শান্তি। অর্থাৎ, যে শান্তি কখনোই ফুরায় না। তাহলে লক্ষ্য করুন, এই ছোট্ট একটি হাদীসের মধ্যে তিনি বিশ্বকে কী সুন্দর শান্তির বার্তা দিলেন ! এ জন্যই আমেরিকার একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক, বিশ্বের ১০০ মহামনিষীর জীবনী সম্পর্কে 'দ্যা হান্ড্রেড' নামে একটি বই লিখতে গিয়ে প্রথম নাম্বারে যার জীবনী নিয়ে আলোচনা

করেছেন, তিনি হলেন বিশ্বনবী ও বিশ্বগুরু হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অথচ বইটির লেখক একজন খ্রিস্টান। তিনি নবীজির অপূর্ব ও অতুলনীয় শিক্ষা দেখে নবীজিকে মহা মনিষীদের তালিকায় এক নাম্বারে রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

শ্রোতামণ্ডলী ! নবীজির নবী হওয়ার তৃতীয় দলীল হল, তাঁর মু'জিযা। মু'জিযার অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালা নবীগণের হাতে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেছেন, যেগুলি তাঁদের নবী হওয়ার প্রকাশ্য দলীল। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে কিছু না কিছু মু'জিযা দিয়েছিলেন। আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা বহু মু'জিযা দিয়েছেন। তাঁর শাহাদাত আঙুলের ইশারায় আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। মক্কার পাথর তাঁকে সালাম করত। আকাশের মেঘমালা তাঁকে ছায়া করে চলত। এক সময় সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছে পানি না থাকার অভিযোগ করলে তিনি একটি ছোট্ট পানির পাত্রে হাত রাখলে তাঁর আঙুল মোবারক দিয়ে ঝর্নার মতো পানি বেরিয়েছিল আর সেই পানি দ্বারা প্রায় ৩০০ সাহাবী উযু করেছিলেন। তাঁর এরকম বহু মু'জিযা আছে।

সুনানে তিরমিযীর ৩৬২৮ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক গ্রাম্য বেদুইন এসে বললঃ بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ؟ আমি কীভাবে জানব যে, আপনি আল্লাহর নবী? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ আমি যদি ঐ খেজুরের কাঁদিকে ডাক দিই আর সে নিচে নেমে আসে, তাহলে কি তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর রসূল ? বেদুইন বললঃ হ্যাঁ। তারপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের কাঁদিটিকে ডাক দিলেন। তখন দেখা গেল কাঁদিটি আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সামনে হাজির হল। অতঃপর তিনি ঐ কাঁদিটিকে আবার নিজের স্থানে গাছে ফিরে যেতে বললেন। কাঁদি নিজের স্থানে ফিরে গেল। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামগণ সকলে এ সবকিছু আশ্চর্য হয়ে দেখছিলেন। এই মু'জিযা দেখে সেই বেদুইন ইসলাম কবূল করে নিয়েছিল। এঘটনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, মু'জিযা হল তাঁর নবী হওয়ার মস্ত বড়ো দলীল।

মনে রাখবেন, পৃথিবীতে অনেক মানুষ বহু অসাধ্যকে সাধন করে ওয়ার্ল্ড গিনেসবুকে নাম রেকর্ড করেছে। এভারেস্ট জয় করা থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়া পর্যন্ত, সবই করতে পেরেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আল-কুরআনের একটি ছোট্ট সূরার মতো কোন সূরা তৈরি করে দেখাতে পারিনি। এ মু'জিযাটিও তাঁর নবী হওয়ার মস্তবড় দলীল।

ঈমানদার ভাই সকল ! নবীজির নবী হওয়ার চতুর্থ দলীল হল, তাঁর সাহাবীগণ। কথায় বলেঃ বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়। অনুরূপভাবে, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি সাহাবী তাঁর নবী হওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁর প্রত্যেকটি সাহাবী বিশ্ববাসীর জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র। অথচ তাঁরা একসময় জাহিলি যুগে এতটা নির্দয় ও নিষ্ঠুর ছিল যে, নিজেদের জীবিত কন্যাসন্তানকে মরুভূমির তপ্ত মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে দিত। তাঁরা এতটা বর্বর ও হিংস্র ছিল যে, চুরি-ডাকাতি করে মানুষের সম্পদ লুঠ করত, অসহায় মানুষের মুখের খাদ্য কেড়ে নিত। সেই জাতি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুধুমাত্র ২৩ বছরের মেহনতে এমন আদর্শবান মানবরূপে গড়ে উঠেছিল যে, পৃথিবীতে তাঁদের তুলনা মেলে না। এটা বিশ্বনবীর নবী হওয়ার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ নয় তো কী ?

ঈমানদার ভায়েরা ! সাহাবায়ে কিরাম কেমন সোনার মানুষ ছিলেন, একটু লক্ষ্য করুন। সহীহ বুখারীর ৪৮৮৯ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেনঃ একদিন ইশার নামাযের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললঃ আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দিন। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্ত্রীদের ঘরে খোঁজ নিলেন, কিছু খাবার আছে কী না ? স্ত্রীগণ বললেনঃ ঘরে খাওয়ার মতো কিছুই নেই। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যে আজ রাতে এই লোকটির মেহমানদারী করতে পার ? আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহম করবেন। তখন আনসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে আবূ তলহা (রযি) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি আছি।

এরপর সাহাবী আবূ তলহা (রযি) মেহমানকে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং নিজের স্ত্রীকে বললেনঃ ইনি আল্লাহর রসূলের মেহমান। বাড়িতে যা খাওয়ার আছে, সামনে পেশ কর। মেহমানদারীতে যেন কোন রকম ত্রুটি না হয়। স্ত্রী বললেনঃ আল্লাহর কসম, বাড়িতে বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। যেহেতু খাবার ছিল কম, তাই আবূ তলহা (রযি) বললেনঃ বাচ্চারা খাবার চাইলে তুমি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিবে। তারপর খাবার নিয়ে মেহমান ও আমার সামনে পেশ করবে। আমরা খেতে বসব, এমন সময় তুমি আলো নিভিয়ে দিবে। আমি অন্ধকারে মুখ নাড়িয়ে খাওয়ার ভান করব। এদিকে মেহমান পেট ভরে খেয়ে নিবে। সাহাবী আবূ তলহার স্ত্রী তা-ই করলেন। মেহমান পেট ভরে খেয়ে নিল। এদিকে হযরত আবূ তলহা ও তাঁর স্ত্রী এবং বাড়ির বাচ্চারা সকলে না খেয়ে রাত কাটালেন। পরদিন সকালে যখন আবূ তলহা (রযি) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসলেন, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আবূ তলহা ও তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের (রাতের বেলা চেরাগ নিভিয়ে) অপূর্ব মেহমানদারী দেখে হেসেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে কুরআন করীমের সূরা হাশরের ৯ নম্বর আয়াত নাযিল করেছেনঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"নবীর সাহাবারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়। যদিও তাদের খাওয়া-দাওয়ায় অভাব থাকে।"

ভাই সকল ! লক্ষ্য করুন, ধর-মার কাট-খাও, এই ছিল যে জাতির স্বভাব, সেই অসভ্য জাতি রাতের অন্ধকারে চেরাগ নিভিয়ে মেহমানদারী করতে শিখেছিল যে মহামানবের পরশে, তিনি হলেন আমার ও আপনার নবী, জগদ্‌গুরু-বিশ্বগুরু, নবীকুল শিরোমণী, শান্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লাম। আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে নবীজির সুন্নতের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ২১

উম্মতের উপর নবীজির ৫টি হক

রবীউল আউয়ালের চতুর্থ জুমুআর বয়ান
২২ রবীউল আওয়াল ১৪৪৩ হিজরী, ২৯ অক্টোবর ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَام عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمَ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউল আউয়াল মাসের ২২ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। এটা বিশ্বনবীর জন্মগ্রহণ ও তাঁর ওফাতের মাস। আল্লাহ তায়ালা সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

"হে রসূল ! আমি আপনাকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত রূপেই পাঠিয়েছি।" অতএব, আজ আমরা আলোচনা করব, উম্মতের উপর নবী রহমাতুল্লিল আলামীনের কী কী হক আছে।

আমরা কুরআন ও হাদীস দ্বারা একথা জানতে পারি যে, উম্মতের উপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৫টি হক আছেঃ (১) তাঁর উপর ঈমান আনা, (২) তাঁকে মনে প্রাণে ভালোবাসা, (৩) তাঁর আনুগত্য করা, (৪) তাঁকে সম্মান করা, (৫) তাঁর জন্য দরূদ ও সালাম পড়া। উম্মতের উপর আল্লাহর রসূলের বিশেষ করে এই ৫টি হক আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর রসূলের হক সমূহ আদায় করার তাওফীক দান করুন।

উম্মতের উপর আল্লাহর রসূলের প্রথম হক, তাঁর উপর ঈমান আনা। এর দলীল হল, আল্লাহ তায়ালা সূরা তাগাবুনের ৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ أَنْزَلْنَا ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো এবং (কুরআন রূপে) যে নূর আমি অবতীর্ণ করেছি, তার উপর ঈমান আনো। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা সব জানেন।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনা যেমন ফরয, ঠিক তেমনি ভাবে নবীজীর উপর ঈমান আনাও ফরয।

মুসনাদে আবূ দাঊদ তয়ালিসীর ৫১১ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ মূসা আশআরী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার আগমনের কথা শুনবে, সে ইয়াহূদী হোক অথবা খ্রিস্টান আর আমার উপর ঈমান আনবে না তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার অর্থ হল, এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনি আল্লাহর রসূল। বিশ্ববাসীকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর যা কিছু নাযিল করেছেন, সব কিছু তিনি আমানতদারীর সাথে উম্মতকে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি শেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নতুন নবী দুনিয়ায় আসবেন না। আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

"মুহম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী।" সহীহ বুখারীর ৩৪৫৫ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "বনী ইসরাঈলকে পরিচালনা করতেন তাদের নবীগণ । কোন নবী

ইন্তিকাল করলে তাঁর জায়গায় অন্য নবী আসতেন। তবে আমার পর কোন নবী আসবেন না। অবশ্য আমার পর কয়েক জন খলীফা হবেন।"

শ্রোতামণ্ডলী ! আমরা এ পর্যন্ত আল্লাহর রসূলের প্রথম হক সম্পর্কে জানতে পারলাম। এবার আমরা তাঁর দ্বিতীয় হক সম্পর্কে আলোচনা করব।

উম্মতের উপর আল্লাহর রসূলের দ্বিতীয় হক, তাঁকে ভালবাসা। তাঁকে শুধু ভালবাসলে হবে না, বরং তাঁকে সৃষ্টি জগতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতে হবে। এমনকী তাঁকে নিজের জানের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে। তা না হলে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না ।

এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ১৫ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা বেশি ভালবাসার পাত্র না হব।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর রসূলকে ভালবাসা উম্মতের উপর ফরয। আর সেটা হতে হবে এমন ভালোবাসা, যা নিজের পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও সকল মানুষের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

এক সময় হযরত উমার (রযি) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর কসম, আপনি আমার নিকট সবার চেয়ে বেশি প্রিয়, তবে আমার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় নন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ হে উমার ! সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে তোমার প্রানের চেয়েও বেশি প্রিয় না হব, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না। তখন হযরত উমার বলেনঃ আল্লাহর কসম, তাহলে এখন আপনি

আমার নিকট আমার প্রাণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। এবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে উমার ! এবার তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হল। এটা সহীহ বুখারীর ৬৬৩২ নম্বর হাদীস। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দয়ার নবীকে নিজেদের জানের থেকেও বেশি ভালবাসার তাওফীক দান করুন।

শ্রোতামণ্ডলী ! উম্মতের উপর আল্লাহর রসূলের তৃতীয় হক, তাঁর আনুগত্য করা। অর্থাৎ তাঁর সুন্নত ও বিধি-বিধানকে মেনে নিয়ে তার উপর আমল করা। আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের ১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ "যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আর আল্লাহ তায়ালা সূরা আল্ ইমরানের ৩১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"হে রসূল ! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ তায়ালা হলেন ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূলের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দ্বারা প্রমাণ হয়, আল্লাহর রসূলের আনুগত্য না করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না । অতএব, রসূলের আনুগত্য করা উম্মতের উপর ফরয। এটা হল নবীজির তৃতীয় হক।

উম্মতের উপর আল্লাহর রসূলের চতুর্থ হক, তাঁকে সম্মান করা। আল্লাহ তায়ালা সূরা ফাত্হের ৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো এবং তাঁকে সাহায্য কর ও তাঁর সম্মান কর এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর

পবিত্রতা জ্ঞাপন কর।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর রসূলের সম্মান করা উম্মতের উপর ফরয।

সুধীবৃন্দ ! সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কতটা সম্মান করতেন, এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করি। ৬ হিজরীতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা করার জন্য সাহাবাদের একটি বড় জামাআত সাথে নিয়ে মক্কায় রওনা হয়েছিলেন। তিনি যখন মক্কার নিকটবর্তী 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যান, তখন কাফিররা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং যুদ্ধ হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অবশেষে সন্ধির মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান হয়। একেই বলা হয় "হুদায়বিয়ার সন্ধি"।

এই সন্ধির সময় মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে উরওয়া ইবনে মাসঊদ নামে এক নেতা নবীজি ও সাহাবাদের অবস্থা জানার জন্য হুদায়বিয়ার মাঠে এসেছিল। নবীজির সাথে সাহাবাদের আচার-ব্যবহার দেখে উরওয়া ইবনে মাসঊদ কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলেছিলঃ হে কুরাইশগণ ! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি রুমের বাদশা কাইসার, পারস্যের বাদশা কিসরা ও হাবাশার বাদশা নাজাশীর দরবারে গেছি। কিন্তু মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবারা তাঁর প্রতি যেমন ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তেমন দৃশ্য আমি কোথায়ও দেখিনি। আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি, তিনি থুতু ফেললে তাঁর সাহাবারা তা হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারা ও গায়ে লাগিয়ে নেন। তিনি যখন কোন আদেশ দেন, তখন তারা সাথে সাথে তা পালন করেন। তিনি উযূ করলে তাঁর উযূর পানি নেওয়ার জন্যে তারা প্রতিযোগিতা করেন। তিনি কথা বললে, সকলে ধ্যানমগ্ন হয়ে খুব আগ্রহের সাথে তারা তাঁর কথা শুনেন। তাঁর সাহাবারা সম্মানের কারণে তাঁর দিকে নজর তুলে তাকান না। অতএব, আমার মনে হয়, তিনি যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন,

তোমরা তা গ্রহণ কর। এ সব কথা সহীহ বুখারীর ২৭৩১ নম্বর হাদীসে লেখা আছে।

ভাই সকল ! আল্লাহর রসূলের সাহাবগণ তাঁকে কতটা সম্মান করতেন, এ হাদীস দ্বারা তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। এ জন্যেই তো সাহাবাগণ হয়েছেন নবীদের পর মানব জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যাইহোক, এ পর্যন্ত আমরা নবীজির ৪টি হক জানতে পারলাম।

উম্মতের উপর আল্লাহর রসূলের পঞ্চম হক, তাঁর জন্য দরূদ ও সালাম পাঠ করা। আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ৫৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নবীর উপর রহমত বর্ষণ করেন আর তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর জন্য রহমতের দুআ করেন। হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নবীর জন্য দরূদ ও সালাম পড়।"

সহীহ মুসলিমের ৪০৮ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন।

সুনানে তিরমিযির ৪৮৪ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার নিকটতম হবে।

ভাই সকল ! আমরা দরূদ পড়া সম্পর্কে একটি জরুরী মাসআলা জেনে রাখি। প্রত্যেক মুসলিমের উপর জীবনে একবার নবীর শানে দরূদ পড়া ফরয। নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পড়া সুন্নতে মুআক্কাদাহ। আর নবীর নাম শুনলে দরূদ পড়া ওয়াজিব। যে মজলিসে বারবার নবীর নাম আসবে, সেখানে একবার দরূদ পড়া ওয়াজিব। আর প্রত্যেক বার দরূদ পড়া

মুস্তাহাব। পরিশেষে আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের সকলকে নবীজির ৫টি হক যথাযত ভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ২২

হাশর মাঠের ৫টি প্রশ্ন

রবীউল আউয়ালের পঞ্চম জুমুআর বয়ান
২৯ রবীউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরী, ৫ নভেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ **وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ** ❁ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ পবিত্র রবীউল আউয়াল মাসের ২৯ তারিখ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, হাশর মাঠের ৫টি প্রশ্ন ও তার জওয়াব। আমরা সকলেই জানি, মৃত্যুর পর কবরে ৩ টি প্রশ্নের জওয়াব দিতে হবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন হাশর মাঠে আল্লাহর সামনে ৫ টি প্রশ্নের জওয়াব দিতে হবে, এ কথা আমরা অনেকেই জানি না। আল্লাহ তায়ালা সূরা রহ্মানের ৪৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ

"যে ব্যক্তি (হাশর মাঠে) নিজের পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে (দুনিয়ায় জীবনযাপন করবে), তার জন্য

রয়েছে দু'টি জান্নাত।" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হাশর মাঠে আল্লাহ সামনে দাঁড়িয়ে হিসাব দেওয়ার ভয় করে এই দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক আমল করবে এবং যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তায়ালা পরকালে তাকে দু'টি জান্নাত দান করবেন।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! এখন জানার বিষয় হল, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন হাশর মাঠে বিচারের সময় আমাদেরকে কী কী প্রশ্ন করবেন ? এ সম্পর্কে সুনানে তিরমিযীর ২৪১৬ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ

"কিয়ামতের দিন যতক্ষণ পর্যন্ত ৫ টি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর দরবার থেকে পা তুলতে পারবে না। প্রশ্ন করা হবে (১) মানুষ তার জীবন কোন্ কাজে ব্যয় করেছে ? (২) যৌবন কোথায় ব্যয় করেছে ? (৩) ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ? (৪) ধন-সম্পদ কোথায় খরচ করেছে ? (৫) ইল্‌ম মুতাবিক কতটা আমল করেছে ? এটা সুনানে তিরমিযীর সহীহ হাদীস।

আমরা লক্ষ্য করি, এ হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন হাশর মাঠে ৫ টি প্রশ্ন করা হবে। সেদিন হাশর মাঠে প্রথম প্রশ্ন হবে গোটা জীবন সম্পর্কে। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, বান্দা ! তুমি গোটা জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছ ? মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করেন নি। বরং মৃত্যুর পর তাঁর সামনে হাজির হয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের পাই টু পাই হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ

তায়ালা সূরা মু'মিনূনের ১১৫ নম্বর আয়াতে আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেনঃ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কি একথা ভেবে নিয়েছ যে, আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি ? আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না ?" আল্লাহ তায়ালা সূরা 'যিলযাল' এর ৭ ও ৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ (٧) وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ(٩)

"যে ব্যক্তি এক যার্‌রা পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে (হাশর মাঠে) তার ফল দেখবে। আর যে ব্যক্তি এক যার্‌রা পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তার প্রতিদান দেখবে।"

অতএব, একথা কখনও ভুলে গেলে হবে না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফেরেশতারা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের আমল লিখছেন। আমরা চায়ের দোকানে কিংবা তাসের আড্ডায় কতটা সময় ব্যয় করলাম, মোবাইলে গান-বাজনা বা গেম খেলতে কতটা সময় নষ্ট হল, সব কিছুই লেখা হচ্ছে। হাশর মাঠে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের চুলচেরা হিসেব নেওয়া হবে।

সুতরাং আমরা সাবধান হয়ে যাই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নেক কাজে ব্যয় করার চেষ্টা করি। ৫ ওয়াক্ত নামায মসজিদে এসে জামাআতের সাথে আদায় করি। যারা কুরআন পড়তে জানি, তারা বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করি। আর যারা জানি না, তারা শেখার চেষ্টা করি। অবসর সময়ে নফল নামায, যিকির-আযকার ও তাসবীহ পড়তে থাকি। তাহলে সেদিন হাশর মাঠে আল্লাহর সামনে জীবনের হিসাব দেওয়া সহজ হবে।

হাশর মাঠে দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে যৌবনকাল সম্পর্কে। যৌবন হল আল্লাহ তায়ালার মস্ত বড় নিয়ামত। যৌবনকালই হল ইবাদাতের মোক্ষম সময়। কিন্তু মানুষ সাধারণত যৌবনকালে অনভিজ্ঞতা ও উন্মাদনার কারণে গোনাহ ও বৃথা কাজে সময় নষ্ট

করে ফেল। যে যুবক মন না চাইলেও মনের বিরোধিতা করে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন হয়, সে যুবকের ফযীলত আল্লাহর নিকট অনেক বেশি। সহীহ বুখারীর ৬৬০ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে যুবক যৌবনকালে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেছে, আল্লাহ তাকে হাশর মাঠে নিজের রহমতের ছায়া তলে জায়গা দেবেন।

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, জীবনের অন্য সময় অপেক্ষা যৌবনকালের ইবাদাতের ফযীলত অনেক বেশি। অথচ আমাদের অনেক যুবক ভাই মনে করে থাকেন যে, এখনও নামায পড়ার সময় হয়নি, হজ্জ করার সময় আসেনি এবং দাড়ি রাখার বয়স হয়নি। মনে রাখবেন, এসব শয়তানি ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের যুবসমাজকে বেশি বেশি ইবাদSত করার তাওফীক দান করুন।

হাশর মাঠে তৃতীয় প্রশ্ন হবে ধন-সম্পদ সম্পর্কে। অর্থাৎ, বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি ধন-সম্পদ কীভাবে কামিয়েছিলে ? হালাল পথে, না হারাম পথে ?

মনে রাখবেন, বর্তমান যুগে মাল কামানোর বহু রাস্তা আবিষ্কার হয়েছে। এর মধ্যে কিছু হালাল ও কিছু হারাম রাস্তা আছে। এগুলির মধ্য হতে কোন্‌টা হালাল আর কোন্‌টা হারাম, তা উলামাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। মাল কামানোর সব রকম হারাম পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকা ফরয।

সুনানে তিরমিযীর ৬১৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ إِنَّهُ لَا يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ "নিশ্চয় যে গোশ্‌ত হারাম মাল খেয়ে তৈরী হয়, তার উপযুক্ত ঠিকানা হল জাহান্নাম।

এ বিষয়ে আমারা হযরত আবূ বকর রযিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা লক্ষ্য করি। সহীহ বুখারীর ৩৮৪২ নম্বর হাদীসে

উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমার পিতা আবূ বকরের একটি গোলাম ছিল। সে প্রতিদিন কিছু অর্থ উপার্জন করে এনে দিত। আবূ বকর (রযি) তার উপার্জন খেতেন।

একদিন সে কিছু খাবার এনে দিল। আবূ বকর (রযি) সেটা খেলেন। তারপর গোলাম বললঃ আপনি জানেন কি, আমি এটা কীভাবে উপার্জন করেছি। আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করে ধোঁকা দিয়ে তাকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। এখন সেই ব্যক্তি তার বিনিময়ে আমাকে এই খাবার দিয়েছে। এটা সেই খাদ্য। আবূ বকর (রযি) গোলামের এ কথা শোনা মাত্রই নিজের মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটের ভিতর যা কিছু ছিল সবই বমি করে ফেললেন।

সম্মানিত ভায়েরা ! আমরা একটু ভেবে দেখি, হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা কতটা জরুরী। আর আবূ বকর (রযি) কত বড় পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন, তা এ ঘটনা দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ঘটনা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন।

হাশর মাঠে চতুর্থ প্রশ্ন হবে, মাল কোন্ পথে খরচ করেছ ? অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে দুনিয়াতে যে ধন-সম্পদ দিয়েছিলাম, তা কোন্ পথে ব্যয় করেছিলে ?

মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদ হালাল পথে খরচ করে, তার সম্পর্কে হাদীসের মধ্যে অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। সহীহ বুখারীর ৭১৪১ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ঈর্ষা করতে হলে দু'রকম ব্যক্তির উপর করা উচিৎ। একজন হল সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে সৎপথে ব্যয় করার

তাওফীক দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা ইল্‌ম দান করেছেন, সে তা দ্বারা মানুষের সমস্যা সমাধান করে এবং অন্যকে ইল্‌ম শিক্ষা দেয়।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় জানা দরকার যে, কারো উপর হিংসা করা জাইয নেই কিন্তু দু'রকম ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা জাইয আছে। হিংসা মানে, কোন ব্যক্তির কাছে আল্লাহর কোন নিয়ামত দেখে তার ক্ষতি চাওয়া। আর ঈর্ষা মানে, কোন ব্যক্তির উপর আল্লাহর কোন নিয়ামত দেখে নিজের জন্যেও সেই নিয়ামতের আকাঙ্ক্ষা করা। এটা জাইয আছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে চেয়েছেন, দু'জন ব্যক্তি এমন আছে, যাদের উপর ঈর্ষা করা উচিৎ। (১) যাকে আল্লাহ ইল্‌ম দিয়েছেন, (২) যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন এবং হালাল পথে তা ব্যয় করার তাওফীক দিয়েছেন। বহু মানুষ এমন আছে, যাদেরকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন কিন্তু তারা মাল হালাল পথে ব্যয় করে না। এরূপ ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র হতে পারে না।

শ্রোতামণ্ডলী ! মাল খরচ করার হালাল ও নেকীর পথ হল ৪টিঃ (১) নিজের ও নিজের পরিবারবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনের উপর ব্যয় করা। (২) দ্বীন কায়েম করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় দান করা। যেমন মক্তব-মাদরাসা ও মসজিদে অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সংগঠন কায়েম করতে সাহায্য করা। (৩) কোন প্রকার সাদকায়ে জারিয়াহ করা, যার সওয়াব কবরে শুয়েও পেতে থাকবে। (৪) সমাজের ইয়াতীম, গরীব, দুস্থ, অসহায় ও বিধবাদেরকে যাকাত, ফিতরা প্রভৃতি সাদকাহ দ্বারা সাহায্য করা। এই ৪টি পথ হল মাল খরচ করার হালাল ও নেকীর পন্থা।

প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, আমরা সাধারণত নিজের বিবি-বাচ্চাদের উপর খরচ করাকে শুধুমাত্র নিজেদের দায়িত্ব মনে করে থাকি। আমরা মনে করি যে, এতে কোন সাওয়াব নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমাদের ইসলাম ধর্মে নিজের

পরিবারবর্গের মুখে হালাল খাদ্য তুলে দেওয়াকেও সাওয়াবের কাজ বলা হয়েছে। সহীহ বুখারীর ৫৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

যে ব্যক্তি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নিজের পরিবারবর্গের উপর খরচ করবে, সেটা তার জন্য হবে সাদকাহ।

ঈমানদার ভায়েরা ! আমরা আলোচনা করছিলাম, কিয়ামতের দিন যতক্ষণ পর্যন্ত ৫ টি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর দরবার থেকে পা তুলতে পারবে নাঃ (১) মানুষ তার জীবন কোন্ কাজে ব্যয় করেছে ? (২) যৌবন কোথায় ব্যয় করেছে ? (৩) ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ? (৪) ধন-সম্পদ কোথায় খরচ করেছে? (৫) ইল্‌ম মুতাবিক কতটা আমল করেছে ?

তাহলে হাশর মাঠের পঞ্চম প্রশ্ন হবে, ইল্‌ম সম্পর্কে। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন, বান্দা! তুমি শরীয়তের হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব ও জাইয-নাজাইয সম্পর্কে যতটা জানতে, তার উপর কতটা আমল করেছিলে ? আমরা সকলেই একথা জানি যে, দিনে ৫ ওয়াক্ত নামায কায়েম করা ফরয। কিন্তু আমরা ক'জন এর উপর আমল করি ? আমরা এও জানি যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কিন্তু আমরা ক'জন দাড়ি রেখেছি ? অথচ আমরা সকলেই মুসলিম হওয়ার দাবিদার।

আমরা সকলেই জানি, সুদ খাওয়া হারাম। এমনকী সুদ দেওয়াও হারাম। কিন্তু আমরা ক'জন সুদের কারবার থেকে পরহেয করে চলি ? আমরা সকলেই জানি, গীবত করা হারাম। কিন্তু আমরা ক'জন গীবত থেকে বেঁচে থাকি। অতএব, হাশর মাঠে আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবেন, বান্দা ! তুমি শরীয়তের হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব ও জাইয-নাজাইয সম্পর্কে যতটা

জানতে, তার উপর কতটা আমল করেছিলে, আমরা তখন কী জওয়াব দেব ?... তাই আসুন আমরা সাবধান হয়ে যাই।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার আগে আগে এই দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক আমল করা এবং যাবতীয় অসৎ কাজ বর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন ।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ২৩

হুকূকুল্লাহ ও হুকূকুল ইবাদ

রবীউস সানীর প্রথম জুমুআর বয়ান

৬ রবীউস সানী ১৪৪৩ হিজরী, ১২ নভেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ وعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ **وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْابِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا** ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউস সানী মাসের ৬ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমরা "হুকূকুল্লাহ ও হুকূকুল ইবাদ" সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। "হুকূকুল্লাহ" মানে, আল্লাহর হক। আর "হুকূকুল ইবাদ" মানে, বান্দার হক। অর্থাৎ, বান্দার উপর আল্লাহর কী হক আছে আর একজন মানুষের অপর মানুষের উপর কী কী হক আছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর হক ও বান্দার হক, এই দু'রকম হক আদায় করা আমাদের উপর ফরয। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই দু'রকম হক আদায় না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহকে রাযি-খুশি করতে পারব না। আর আমাদের দুনিয়ার জীবনও শান্তিময় হবে না। এই হক দু'টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তা বাস্তবায়ন করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

ভাই সকল ! আল্লাহ তায়ালা নিজের হক ও বান্দাদের হক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৩৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْابِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সাথী-সঙ্গী, মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর সাথেও সদ্ব্যবহার কর।"

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মধ্যে মানব জাতিকে দু'প্রকার হক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বপ্রথম আমাদের উপর যে হকটি আদায় করা জরুরী, তা হল হুকূকুল্লাহ। অর্থাৎ, আল্লাহর হক। আল্লাহর হক বলতে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, শির্ক না করা। তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

শির্কের বিষয়টি আমাদের অনেকেরই অজানা। শির্কের অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করা। আর এই শির্ক দু'প্রকারঃ (১) شِرْكٌ جَلِيٌ অর্থাৎ, প্রকাশ্য শির্ক। (২) شِرْكٌ خَفِي অর্থাৎ, গোপন শির্ক।

প্রকাশ্য শির্ক মানে, আল্লাহর মতো অন্য কাউকে প্রভু মনে করা। অনুরূপ ভাবে, আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী আছে,

তাতে কাউকে শরীক করাটাও শির্ক। যেমন, কাউকে অন্নদাতা মনে করা। কখনও দেখা যায়, কোন কোন গাড়ির পিছনে লেখা থাকে "বাপ আমার জন্মদাতা, গাড়ি আমার অন্নদাতা"। মনে রাখবেন, এভাবে গাড়িকে 'অন্নদাতা' মনে করা প্রকাশ্য শির্ক। কেননা, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হলেন রুজির মালিক। আল্লাহর ৯৯টি নামের মধ্যে একটি নাম হল 'রায্যাক'। 'রায্যাক' মানে, মহা অন্নদাতা।

ঈমানদার ভায়েরা ! এখানে একটি অতিশয় জরুরী মাসআলা বলে রাখি। আমাদের পরিবেশে যদি কারো নাম হয় আব্দুর রায্যাক, তাহলে আমরা সাধারণত তাকে 'রায্যাক' বলে ডাকি। এটা হারাম ও গোনাহে কবীরা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ 'রায্যাক' হতে পারে না। অনুরূপ ভাবে, কারো নাম আব্দুল খালেক হলে, আমরা তাকে 'খালেক' বলে ডাকি। এটাও হারাম ও গোনাহে কবীরা। 'খালেক' মানে, স্রষ্টা। অতএব, কোন মানুষকে খালেক বলা যায় না। এমনি ভাবে, আব্দুস সামাদকে 'সামাদ' বলে ডাকা, আব্দুর রহমানকে 'রহমান' বলে ডাকা, আব্দুল গফফার ও আব্দুল গফুরকে 'গফফার' ও 'গফুর' বলা হারাম ও কবীরা গোনাহ। আমরা অনেকে অজান্তে এসব গোনাহ করে থাকি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সংশোধন হওয়ার তাওফীক দান করুন।

যাইহোক, শির্কের দ্বিতীয় প্রকার হল شِرْكٍ خَفِي অর্থাৎ, গোপন শির্ক। এই গোপন শির্ক হচ্ছে রিয়াকারি। লোক দেখানোর জন্য কোন কিছু করার নাম, রিয়াকারি। লোকের কাছে সুনাম-সুখ্যাতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত-উপাসনা ও সৎকাজ করা গোপন শির্ক। একে 'শির্কে খফী' এজন্য বলা হয় যে, 'খফী' মানে, গোপন। আর এভাবে লোকের কাছে সুনাম-সুখ্যাতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত-উপাসনা ও সৎকাজ করা যে শির্ক, তা অনেকেই জানে না। তাই একে গোপন শির্ক বলা হয়। মনে

রাখবেন, শির্কে খফীর কারণে কেউ কাফের হয় না। তবে, লোক দেখানোর জন্য যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে, আল্লাহর কাছে সে কোন সওয়াব পাবে না । আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতে বলেছেনঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا

"যে ব্যক্তি নিজের রবের সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে আর নিজের রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে তফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে, একব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেছিলঃ আমি মাঝে মধ্যে যখন কোন সৎকাজ করি, আমার উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই হয়ে থাকে কিন্তু সাথে সাথে মনে এ আশাও জাগে যে, লোকে আমার আমল দেখুক। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার কোন উত্তর দেন নি। তারপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সূরা কাহ্‌ফের শেষের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! রিয়াকারি সম্পর্কে আমরা কয়েকটি হাদীস লক্ষ্য করি। মুসনাদে আহমাদের ১৭১৪০ নম্বর হাদীসে শাদ্দাদ ইবনে আওস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, " যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ল, সে শির্ক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখল, সে শির্ক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান-সাদকাহ করল, সে শির্ক করল।"

মুসনাদে আহমাদের ২৩৬৩০ নম্বর হাদীসে সাহাবী মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের উপর

ছোট শির্কের বেশি ভয় করি। সাহাবারা বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! ছোট শির্ক বলতে কী ? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ রিয়াকারি হচ্ছে ছোট শির্ক।

কিয়ামতের দিন যখন আমল কারীদের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা রিয়াকারীদের বলবেনঃ তোমরা দুনিয়ায় যাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করেছিলে, তাদের কাছে যাও, তাদের কাছে কোন পুরস্কার পাও কী না, তা দেখে নাও।

সুনানে ইবনে মাজা'র ৪২০২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আমি শির্ক থেকে পাক। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন এমন আমল করবে, যাতে সে অন্য কাউকে শরীক করেছে, সেই আমলের আমার কোন প্রয়োজন নেই। যাকে সে শরীক করেছে, আমল তার জন্যই হবে।

অতএব, আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে রিয়া মুক্ত মনে, ইখলাসের সাথে নেক আমল করার তাওফীক দান করুন।

সুধীবৃন্দ ! আমরা "হুকূকুল্লাহ ও হুকূকুল ইবাদ" সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ পর্যন্ত "হুকূকুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর হক সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমাদের উপর দ্বিতীয় হক হচ্ছেঃ "হুকূকুল ইবাদ" বা বান্দাদের হক। সূরা নিসা'র ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের হকের পর বান্দাদের হক আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْابِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

" তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, আত্মীয়-স্বজন,

ইয়াতীম-মিসকীন, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সাথী-সঙ্গী, মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার কর।"

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের হকের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পিতা-মাতার হকের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মানুষের হকের কথা বলেছেন। কুরআন মজীদের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা নিজের ইবাদতের সাথে সাথে পিতা-মাতার হকের কথা বলেছেন। যেমন, সূরা লুকমানের ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ "তুমি আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর।"

আল্লাহর হকের পর পিতা-মাতার হকের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, আমাদের সমস্ত নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর-ই দান। এই দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার পর আমাদের উপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ হল পিতামাতার। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা দুনিয়ার মুখ দেখেছি। তাঁরা সীমাহীন পরিশ্রম করে আমাদেরকে লালন-পালন করেছেন। একমাত্র গণ্ডমূর্খ ও নিমক হারাম ছাড়া কেউ পিতামাতার এ অবদানকে অস্বীকার করতে পারে না। কোন সন্তান যদি সারা জীবনও বাপ-মায়ের খিদমত করে, তবুও তাঁদের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনের একাধিক জায়গায় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন।

পিতা-মাতার সেবা-যত্নের প্রতি উৎসাহ দিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ " যে ব্যক্তি চায় তার আয়ু বৃদ্ধি হোক ও তার আয়-রোজগারে বরকত হোক, সে যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করে।" এটা সাহাবী আনাস (রযি) হতে বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের ১৩৪০১ নম্বর হাদীস।

এ হাদীস দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, পিতামাতার সেবা-যত্ন করলে মানুষের আয়ু এবং রুজি-রোজগারে বরকত হয়। সুনানে তিরমিযীর ১৯০০ নম্বর হাদীসে আবুদ্ দারদা(রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বাপ হলেন বেহেশতের মধ্যম দরজা। সেটাকে নষ্ট করা অথবা হিফাযত করা তোমার ইচ্ছে। ইমাম দূলাবী (রহ) 'আলকুনা' নামক কিতাবের ১৯১১ নম্বর হাদীসে সাহাবী আনাস (রযি) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ "জান্নাত রাখা আছে মা'র পায়ের তলায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে মা-বাপের খিদমত করার তাওফীক দান করুন।

শ্রোতামণ্ডলী ! সূরা নিসা'র ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ নিজের হকের পর ৮ শ্রেণির বান্দাদের হকের কথা বলেছেনঃ (১) পিতা-মাতার সাথে 'সদ্ব্যবহার। (২) وَبِذِى الْقُرْبٰى আত্মীয়-স্বজনের হক। আত্মীয়-স্বজনের হক বলতে, তাদেরকে সাধ্য মতো আর্থিক সাহায্য ও সেবা-যত্ন করা এবং তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা, তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া, ইত্যাদি। (৩) وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ ইয়াতীম-মিসকীনদের হক। ইয়াতীম-মিসকীনদের হক মানে, তাদের প্রতি সদয় হওয়া, বিপদাপদে তাদের সাহায্য করা। (৪) وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হক। ইবনে আব্বাস (রযি) বলেছেনঃ ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী মানে ওই সমস্ত প্রতিবেশী, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে। (৫) وَالْجَارِ الْجُنُبِ এমন প্রতিবেশী, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। প্রতিবেশী হিসাবে তারও হক আছে। (৬) وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ আশপাশের সঙ্গী-সাথীর হক। যারা বিভিন্ন রকম পেশা ও কাজকর্মের সুবাদে আমাদের সঙ্গী-সাথী হয়ে থাকে, তাদের সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করা জরুরী। অনুরূপ ভাবে রেল, বাস

প্রভৃতি যানবাহনে যারা আমাদের সাথে সফর করেন, সেই সমস্ত সঙ্গীদেরও হক আছে। তাদের সুবিধা-অসুবিধার খেয়াল রাখতে হবে। (৭) وَابْنِ السَّبِيْلِ মুসাফিরের হক। উদাহরণ স্বরূপ, মুসাফিরকে পথ বলে দেওয়া তার হক। (৯) وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ নিজের দাস-দাসী ও অধীনস্তদের হক। যারা আমাদের অধীনে কর্মচারী রূপে কাজ করে, তাদেরও হক আছে। তাদের উপর জুলুম করা যাবে না । সময় মতো তাদেরকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। এটা তাদের হক।

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে সব শ্রেণির মানুষের হক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তিনি এখানে ৮ শ্রেণির মানুষের নাম উল্লেখ করেছেন। অতএব, আমাদের প্রত্যেককে খেয়াল রাখতে হবে, যেন আমাদের আচার-ব্যবহারে কোন মানুষ কষ্ট না পায় এবং আমরা যেন সুখ-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি।

পরিশেষে আমরা সকলে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের সকলকে তাঁর হক ও তাঁর বান্দাদের হক সমূহ আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ২৪

ইখলাসের গুরুত্ব

রবীউস সানীর দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

১৩ রবীউস সানী ১৪৪৩ হিজরী, ১৯ নভেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউস সানী মাসের ১৩ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, ইখলাসের গুরুত্ব। প্রথমে জেনে রাখা দরকার, ইখলাস কাকে বলে ? ইখলাস বলা হয়, নির্ভেজাল অন্তরে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর জন্য কোন আমল করা, যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কোন প্রকার দুনিয়াবি স্বার্থ মিশ্রিত থাকে না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বান্দাদেরকে ইখলাসের সাথে ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন করীমের সূরা বায়্যিনা'র ৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ

"তাদেরকে শুধুমাত্র এই নির্দেশই করা হয়েছে যে, তারা যেন খাঁটি মনে হকের অনুসারী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে।" বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হল, আল্লাহ তায়ালা ইখলাসের নামে কুরআন মজীদে একটি সূরা নাযিল করেছেন, যার নাম হল 'সূরা ইখলাস'। অতএব, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে একথা মনে রাখা উচিত যে, ইখলাস বিহীন কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবূল হয় না। এ জন্যই ইমাম বুখারী (রহ) সহীহ বুখারীর প্রথম

হাদীস বর্ণনা করেছেন এই ইখলাস সম্পর্কে। অর্থাৎ, সহীহ বুখারীর ১ নম্বর হাদীস হল ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে।

সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসে হযরত উমার ইবনুল খত্তাব (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মসজিদে নববীর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেনঃ আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"নিশ্চয় সমস্ত আমলের সাওয়াব নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রতিটি মানুষ যেমন নিয়্যাত করবে, তেমন প্রতিফল পাবে। সুতরাং, যার হিজরত হবে দুনিয়ার কোন জিনিসের লোভে অথবা কোন মহিলার সাথে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরতের প্রতিদান সেটাই হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।" এপর্যন্ত হাদীসের তরজমা শেষ হল।

সুধীবৃন্দ ! এ হাদীসের বিশেষ একটি প্রেক্ষাপট আছে। মনে রাখবেন, এখন যেমন ঈমান গ্রহণের পর ইসলামের প্রথম বিধান হল নামায, অনুরূপভাবে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরত করার পর ইসলামের প্রথম যুগে, ঈমান গ্রহণের পর প্রথম নির্দেশ ছিল হিজরত করা। হিজরত বলতে, নিজের ঈমান বাঁচানোর জন্য ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যাওয়া। যেহেতু তখন মদীনা ছাড়া অন্য কোন জায়গায়, বিশেষ করে মক্কায় দ্বীন কায়েম করা সহজ ছিল না, তাই ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় হিজরত করা ফরয ছিল। আর এ বিধান মক্কা বিজয় পর্যন্ত বহল ছিল।

সেই সময়ের ঘটনা। উম্মে কয়েস নামে মক্কার একজন মহিলা ইসলাম গ্রহণের পর হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। অথচ ওই মহিলার সঙ্গে মক্কার এক ব্যক্তির বিয়ের কথা চলছিল। তিনি মতামত জানার জন্য মহিলার কাছে চিঠি

লিখলেন। মহিলা সাহাবিয়া মদীনা থেকে জবাব দিয়ে বললেনঃ যদি তুমি হিজরত করে মদীনায় চলে আসো, তাহলে আমি তোমার সাথে বিয়ে করতে রাজি আছি। তখন সেই ব্যক্তি তাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি মনে করেছিলেন, মদীনায় গেলে হিজরত করাও হবে আবার বিয়ে করাও হবে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা জানতে পেরে মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলেছিলেনঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"নিশ্চয় সমস্ত আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রতিটি মানুষ যেমন নিয়্যাত করবে, তেমন ফল পাবে।" তারপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

" যে ব্যক্তির হিজরত দুনিয়ার কোন জিনিসের লোভে অথবা কোন মহিলার সঙ্গে বিয়ের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরতের ফল তা-ই মিলবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।" অর্থাৎ, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে দিলেন যে, হিজরতের মতো ফরয আমলের নিয়্যাতের মধ্যে কোন রকমের সংমিশ্রণ উচিত নয়।

মুহতারম ! আমরা আলোচনা করছিলাম নিয়্যাত ও ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমান ও আমল গ্রহণ করা হবে ইখলাসের ভিত্তিতে। এ সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে একটি হাদীস লক্ষ্য করি। সহীহ মুসলিমের ৪৮১৭ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, ৩ শ্রেণির মানুষকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাযির করে ইখলাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবেঃ (১) আলিম, (২) মুজাহিদ, (৩) দাতা। এদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা দুনিয়াতে কী উদ্দেশ্যে আমল করেছিলে ? তখন

এদের প্রত্যেকেই জওয়াব দিবে, ওগো আল্লাহ ! আমরা তোমার সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য আমল করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা উত্তরে বলবেনঃ তোমরা মিথ্যা বলছ। তোমরা দুনিয়াতে আমল করেছিলে এ জন্য যে, লোকে তোমাদেরকে আলিম বলবে, মুজাহিদ বলবে এবং বড় দানশীল বলবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে হুকুম করবেন, যাও এদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

ঈমানদার ভাইসকল ! এখানে মনে রাখা দরকার যে, কিয়ামতের দিন শুধু এই ৩ শ্রেণির মানুষকে ডেকে ইখলাসের হিসেব নেওয়া হবে, তা নয়। বরং এ হাদীসের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ৩ শ্রেণিকে পেশ করা হয়েছে। কেননা, এই আমল ৩ টির ক্ষেত্রে রিয়াকারি হয় তুলনামূলক বেশি।

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, আমলের মধ্যে ইখলাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যদি কেউ ঈমান আনে আর তার ঈমানের মধ্যে ইখলাস না থাকে, তাহলে তার ঈমান হবে নিফাক। তাকে মু'মিন বলা হবে না। সে হবে মুনাফিক। মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ১৪৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিকদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের গভীর তলদেশ।"

অনুরূপভাবে, যদি আমল ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য না হয়, বরং তার মধ্যে দুনিয়াবি কোন জিনিসের সংমিশ্রণ থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে সেই আমলের কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না। আল্লাহর জন্য ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমল করলে তবেই আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

সাওয়াবের নিয়্যাতে নিজের পরিবারের উপর খরচ করলে সাদকাহ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীর ৫৫ নম্বর

হাদীসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

"মানুষ নিজের পরিবারবর্গের উপর সাওয়াবের নিয়্যাতে খরচ করলে সেটাও তার জন্য হয় সাদকাহ।" এ হাদীসের মধ্যে 'ইহ্তিসাব' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর 'ইহ্তিসাব' শব্দের অর্থ হল, কোন আমল খাঁটি অন্তরে এবং সাওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য করা। সহীহ বুখারীর ২০১৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

" যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রমযানে রোযা রাখবে, তার বিগত জীবনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" এ হাদীসের মধ্যেও রোযা নামক ইবাদত সাওয়াবের নিয়্যাতে পালন করতে বলা হয়েছে।

অনুরূপ ভাবে, সহীহ মুসলিমের ১৬৬৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় সাওয়াব হাসিল করার নিয়্যাতে কদরের রাতে নফল নামায পড়বে, তার বিগত জীবনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" এ হাদীসেও শবে কদরে ইবাদত করতে বলা হয়েছে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে। বোঝা গেল, প্রত্যেকটি আমল করতে হবে ইখলাসের সাথে। অর্থাৎ, সাওয়াব পাওয়ার নিয়্যাতে।

সুনানে নাসায়ীর ১৯৯৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ احْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ

"যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের জানাযা নামায পড়ল এবং তাকে দাফন করল, তাকে দুই উহুদ পাহাড় পরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হবে।" এ হাদীসের মধ্যেও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে, ইখলাসের সাথে আমল

করার কথা বলা হয়েছে। এ দ্বারা বোঝা যায়, যে কোন আমল ইখলাস ও খাঁটি নিয়্যাতে না করলে আল্লাহর কাছে তার কানাকড়ি পরিমাণও মূল্য নেই।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আসুন এবার আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। বিষয়টি হল, ইখলাস বিহীন আমলের চেয়ে ইখলাসের সাথে কোন নেক আমলের শুধু নিয়্যাত করা অনেক ভাল। কেননা, ইখলাস বিহীন আমল করলে কোন সাওয়াব মেলে না। কিন্তু যদি কোন নেক আমলের শুধু নিয়্যাত করা হয়, তারপর কোন কারণবশতঃ সেটা করার তাওফীক না হয়, তবুও আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার আমলনামায় সাওয়াব লিখে দেন। এ বিষয়ে সহীহ মুসলিমের ২৩৩ নম্বর হাদীসে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِحَسَنَةٍ وَّلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً

"যদি আমার বান্দা কোন নেক কাজের নিয়্যাত করে আর তার সে আমল করার তাওফীক হয় না, তবুও আমি তার জন্য সেই আমলের সাওয়াব লিখে দিই।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, ইখলাসের সাথে শুধু নিয়্যাত করলে আমলের সাওয়াব মিলে যায়। এ জন্যই আল্লামা সুয়ূতী (রহ) জামে সগীর কিতাবে ৯২৭৬ ক্রমিক নম্বরে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ "মু'মিন বান্দার কোন আমল করার জন্য খাঁটি মনে নিয়্যাত করাটা তার (ইখলাস বিহীন) আমলের চেয়ে উত্তম।" অর্থাৎ, বে-ইখলাসের সাথে আমল করার চেয়ে ইখলাসের সাথে কোন আমলের শুধু নিয়্যাত করা ভাল। হাদীসটির সূত্র দুর্বল হলেও ইমাম সাখাবী (রহ) বলেছেনঃ হাদীসটি ৪ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাসান পর্যায়ের সহীহ।

ভাই সকল ! নিয়্যাতের কারণে যে কোন দুনিয়াবি কাজেও অফুরন্ত নেকী কামানো সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, ঘর

নির্মাণের সময় দেওয়ালে জানালা তৈরী করা একটি দুনিয়াবি কাজ। যদি কেউ এই নিয়্যাতে জানালা রাখে যে, ফজরের সময় এই জানালা দিয়ে আযানের আওয়াজ আসবে আর আমি ঘুম থেকে উঠে সময় মতো নামায আদায় করতে পারব, তাহলে এই জানালা তৈরী করাটা হয়ে যাবে ইবাদত। যতদিন ওই জানালা থাকবে, ততদিন ফেরেশতারা তার আমলনামায় নেকী লিখতে থাকবেন। সুবহানাল্লাহ ! শুধুমাত্র নিয়্যাতের কারণে একটি দুনিয়াবি কাজেও অসংখ্য নেকী পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে, নিয়্যাতের কারণেই একটি ইবাদতের মধ্যে কয়েক প্রকার ইবাদতের সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি ঘর থেকে উযূ করে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে রওনা হল। যাওয়ার সময় সে নিয়্যাত করল মসজিদে গিয়ে নামায পড়ব, পথে লোকজনকে সালাম করব, ই'তিকাফের নিয়্যাতে সুন্নত তরীকায় মসজিদে প্রবেশ করব, দু'রাকআত দুখূলুল মসজিদ নামায পড়ব ও নামায আদায়ের পর মুসলিম ভাইদের সাথে কুশল বিনিময় করব, তাহলে সে ব্যক্তি মসজিদে রওনা হওয়ার সময় এতগুলি আমলের সাওয়াব পেয়ে যাবে। এজন্যই সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসে হযরত উমার ইবনুল খত্তাব (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মসজিদে নববীর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেনঃ আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"নিশ্চয় সমস্ত আমলের সাওয়াব নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রতিটি মানুষ যেমন নিয়্যাত করবে, তেমন প্রতিফল পাবে। সুতরাং, যার হিজরত হবে দুনিয়ার কোন জিনিসের লোভে অথবা কোন মহিলার সাথে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরতের প্রতিদান সেটাই হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।"

অতএব, যদি কেউ নামায কায়েম করে লোক দেখানোর জন্য, কেউ যদি হজ্জ করে হাজী উপাধি পাওয়ার জন্য কিংবা কেউ যদি দান-সাদকাহ করে সুনাম-সুখ্যাতির জন্য, তাহলে সে আল্লাহর কাছে কোন সাওয়াব পাবে না। তাই আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সমস্ত আমল ইখলাসের সাথে করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বয়ান নম্বর ২৫

৬টি আমল ও তার ফযীলত

রবীউস সানীর তৃতীয় জুমুআর বয়ান
২০ রবীউস সানী ১৪৪৩ হিজরী, ২৬ নভেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ❁ **هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ** ❁ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউস সানী মাসের ২০ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা ৬টি বিশেষ আমল ও তার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। পবিত্র কুরআনের সূরা রহমানের ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ "সৎকাজের প্রতিদান, উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে ?" এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মানুষ ছোট-বড় যে কোন সৎকাজ করবে, আল্লাহ তায়ালা

তার জন্য পরকালে উত্তম পুরস্কার রেখেছেন। তার মধ্যে কিছু আমল এমন আছে, যেগুলির পুরস্কার নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে।

যেমন, সহীহ মুসলিমের ২৬৯৯ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরা রযিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (১) যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়াবি বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দেবেন। (২) যে কেউ কোন অভাবগ্রস্তের সহযোগিতা করবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে স্বচ্ছলতা দেবেন। (৩) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। (৪) মানুষ যতক্ষণ তার কোন ভায়ের সাহায্য করায় মশগুল থাকে, আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ তাকে সাহায্য করতে থাকেন। (৫) যে ব্যক্তি দ্বীনি শিক্ষা হাসিল করার উদ্দেশ্যে চলে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন। (৬) মানুষেরা যখন আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পড়ে এবং তারা একে অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়, তখন তাদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নেমে আসে ও আল্লাহর রহমত তাদের ছেয়ে ফেলে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের চতুর্দিকে ঘিরে থাকেন। আর আল্লাহ তায়ালা নিজের নিকট মহলে ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করে থাকেন। (নবীজি এও বলেছেনঃ) যে ব্যক্তি নেক আমলে পিছিয়ে থাকে, বংশগৌরব তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। এটা সহীহ মুসলিমের ২৬৯৯ নম্বর হাদীস।

সুধীবৃন্দ ! লক্ষ্য করুন, এ হাদীসে রসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ ৬টি আমলের ফায়েদা বর্ণনা

করেছেন। আমরা ধারাবাহিক ভাবে এই আমলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করছি।

প্রথম আমলঃ অপরের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে সহযোগিতা করা। তিনি বলেছেনঃ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়াবি বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দেবেন।" মনে রাখা দরকার যে, সুখ-দুঃখের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি কাউকে বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার কাউকে সুখ-শান্তি দিয়ে পরীক্ষা করেন। অতএব, কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দেখলে মনে করতে হবে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে আমাকেও এরূপ বিপদের সম্মুখীন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমাকে ভাল রেখেছেন। এটা তাঁর মেহেরবানী। এই ভেবে সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। যারা এভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কিয়ামতের দিন মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

দ্বিতীয় আমলঃ অভাবগ্রস্তের সহযোগিতা করা। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "যে কেউ কোন অভাবগ্রস্তের সহযোগিতা করবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে স্বচ্ছলতা দেবেন।" এখানে মনে রাখা দরকার যে, কোন অভাবগ্রস্তকে কিছু দেওয়াটা যেমন তার সহযোগিতা, তেমনি অভাবগ্রস্তকে ঋণ মেটানোয় ছাড় দেওয়াটাও বড় ধরণের সহযোগিতা। কুরআন মজীদের সূরা বাকারার ২৮০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"যদি কেউ অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দাও। আর যদি ঋণ মকুব করে দাও, তাহলে সেটা হবে খুবই উত্তম কাজ। যদি তোমরা এটা জানতে (তাহলে এর উপর আমল করতে)।"

শ্রোতামণ্ডলী ! সহীহ বুখারীর ২০৭৮ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "একজন ব্যবসায়ী খরিদ্দারদের ধার দিত। যখন সে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখত, তখন তার কর্মচারীদের বলতঃ ওকে মাফ করে দাও। হয়ত, এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা এই আমলের বাহানায় তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" বোঝা গেল, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটু অবকাশ দেওয়া বা সম্ভব হলে ঋণ মাফ করে দেওয়া, খুবই ফযীলতপূর্ণ কাজ।

তৃতীয় আমলঃ অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। এটা মস্তবড় আমল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।"

মনে রাখবেন, একে অপরের সম্মান বজায় রাখা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। তাই যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে অপরের দোষ গোপন করে সম্মান বজায় রাখবে, আল্লাহ তায়ালা হাশর ময়দানে তার দোষ গোপন রেখে মান-সম্মানের হিফাযত করবেন। আমরা অনেকে এমন আছি, কারও কোন দোষ-ত্রুটি জানা থাকলে তা খুব আগ্রহের সাথে অপরের কাছে বলে বেড়াই। লোকের দোষ-ত্রুটি প্রচার করা যেন আমাদের বড় দায়িত্ব। অথচ এভাবে মানুষের দোষচর্চা করা গীবত ও কবীরা গোনাহ। আল্লাহ

তায়ালা আমাদের সকলকে সব রকম কবীরা গোনাহ থেকে হিফাযত করুন।

চতুর্থ আমলঃ অপরকে সাহায্য করা। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اَللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

" কোন বান্দা যতক্ষণ কোন ভায়ের সাহায্য করায় মশগুল থাকে, আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ সেই বান্দার সাহায্য করতে থাকেন।" জনসেবা বা মানুষের খিদমত করা আল্লাহর কাছে কত বড় প্রিয় আমল, হাদীসের এ ছোট বাক্য দ্বারা খুব সহজেই তা বুঝে আসে। বর্তমান আমরা মানুষের মদত করতে চাই না। অথচ এটা মহা ফযীলতপূর্ণ আমল।

'তরগীব' নামক কিতাবের ৯৫৪ নম্বর হাদীসে হযরত উমার ইবনুল খত্তাব (রযি) হতে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন আমলের ফযীলত সবচেয়ে বেশি ? উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ মু'মিনকে খুশি করা ; ক্ষুধার্তকে খেতে দেওয়া ; বস্ত্রহীনকে কাপড় দেওয়া ; কোন অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন মেটানো সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ কাজ।

পঞ্চম আমলঃ দ্বীনি শিক্ষা হাসিল করা। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি দ্বীনি শিক্ষা হাসিল করার উদ্দেশ্যে চলে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন।" আমরা জানি, ইল্‌ম ছাড়া কোন আমল সুন্দর ও সঠিক ভাবে করা যায় না। তাই যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার জন্য বার হয়, সে যেন জান্নাতের পথে চলে।

সুনানে ইবনে মাজা'র ২১৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে "হযরত আবূ যার (রযি) বলেছেনঃ একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, হে আবূ যার ! সকালবেলা কুরআনের একটি আয়াত শেখা তোমার জন্য ১০০ রাকআত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর সকালবেলা ইল্‌মের কিছু অংশ শেখা (সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা হোক বা না হোক) তোমার জন্য ১০০০ রাকআত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।" সুবহানাল্লাহ !

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বেশি বেশি দ্বীনি ইল্‌ম হাসিল করার তাওফীক দান করুন।

ষষ্ট আমলঃ কুরআন শেখা ও শেখানো। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মানুষেরা যখন আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পড়ে এবং তারা একে অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়, তখন তাদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নেমে আসে ও আল্লাহর রহমত তাদের ছেয়ে ফেলে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের চতুর্দিকে ঘিরে থাকেন। আর আল্লাহ তায়ালা নিজের নিকট মহলে ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করে থাকেন।"

সহীহ বুখারীর ৫০২৭ নম্বর হাদীসে উসমান (রযি) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهُ "তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।"

ঈমানদার ভায়েরা ! সহীহ মুসলিমের ২৬৯৯ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ৬টি আমলের কথা উল্লেখ করার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

" যে ব্যক্তি নেক আমলে পিছিয়ে থাকে, বংশগৌরব তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।" অর্থাৎ, পরকালে মুক্তি পেতে হলে নিজে ঈমান ও আমল সঞ্চয় করতে হবে। হাশর মাঠে শুধুমাত্র বংশগৌরব কিংবা আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কেউ রেহাই পাবে

না। এ সম্পর্কে সূরা মু'মিনূনের ১০১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُونَ

"যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন মানুষদের পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা একে অপরকে কোন কিছু জিজ্ঞেসও করবে না।"

মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা নামক কিতাবে ৩৭৬৩৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, পুলসিরাত অতিক্রম কারীদের শেষে এক ব্যক্তি পেটের উপর গড়াগড়ি দিয়ে চলবে। সে বলবেঃ হে আমার প্রভু ! আপনি আমাকে কেন পিছিয়ে দিয়েছেন ? তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ আমি তোমাকে পিছিয়ে দেই নি। বরং তোমার আমল তোমাকে পিছিয়ে দিয়েছে।

এ দ্বারা বোঝা যায়, আমলে যে পিছিয়ে থাকে বংশগৌরব তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। আমরা পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বেশি বেশি আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ২৬

নামায

রবীউস সানীর চতুর্থ জুমুআর বয়ান
২৭ রবীউস সানী ১৪৪৩ হিজরী, ৩ ডিসেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ **حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ** ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউস সানী মাসের ২৭ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, নামায। ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব হল নামায। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাদেরকে সর্বপ্রথম নামায কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হত। এ দ্বারা বোঝা যায়, মু'মিনের জন্য নামাযের গুরুত্ব খুবই অপরিসীম। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন করীমের সূরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

" তোমরা সমস্ত নামাযের পাবন্দি কর, বিশেষ করে আসরের নামাযের পাবন্দি কর। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।" এ আয়াতের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করতে বলেছেন। বিখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম তবারী (রহ) তাফসীরে তবারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এখানে নামাযের পাবন্দি করা মানে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত

যথাসময়ে এমন ভাবে আদায় করা যেন একটি নামাযও কাযা না হয়।

ঈমানের পর নামায হল দ্বীন-ইসলামের প্রথম বুনিয়াদ। এ জন্যই ইমাম বাইহাকীর শুআবুল ঈমান কিতাবের ২৮০৭ নম্বর হাদীসে হযরত উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ "নামায হল, দ্বীনের স্তম্ভ।"

বিশেষ করে মনে রাখা দরকার, কিয়ামতের দিন হাশর মাঠে সর্বপ্রথম যে জিনিসের হিসাব নেওয়া হবে, সেটা হল নামায। সুনানে নাসায়ীর ৪৬৫ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

"কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম যে জিনিসের হিসাব নেওয়া হবে, সেটা হল নামায। যদি নামাযের হিসাব সঠিক থাকে, তাহলে সে সফল হবে। আর যদি নামাযের হিসাব সঠিক না হয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে।"

কুরআন করীমে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ৪২ ও ৪৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۞

"জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কী কারণে জাহান্নামে গেছ ? তারা বলবেঃ আমরা (দুনিয়াতে) নামায পড়তাম না (তাই জাহান্নামে আছি)।" এ দ্বারা বোঝা গেল, একজন মু'মিনের জীবনে ঈমানের পর নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই নামায ত্যাগ করলে মানুষ হবে জাহান্নামী।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! নামায আমাদের জীবনে বয়ে আনে রহমত ও বরকত। নামায হল যাবতীয় কামিয়াবী ও

সফলতার চাবিকাঠি। এ জন্যই মুয়ায্যিন প্রতিদিন ৫ বার আযানের মধ্যে বলে থাকে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "এসো সফলতার দিকে"।

আল্লাহ তায়ালা সূরা মু'মিনূনের শুরুতে ঈমানদারদের সফলতার ৬ টি কারণ উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম কারণ হল নামায কায়েম করা। আল্লাহ বলেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞

"ওই সমস্ত ঈমানদারগণ সফলকাম, যারা বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করে।" পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা নামাযের প্রতি যত্নবান ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের সর্বচ্চ মাকাম ঘোষণা করে বলেছেনঃ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"এরাই হল জান্নাতুল ফিরদাউসের মালিক। সেখানে এরা অনন্তকাল বসবাস করবে।" দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে নামাযের পাবন্দী করে জান্নাতুল ফিরদাউস হাসিল করার তাওফীক দান করুন।

মুসল্লী ভাই সকল ! সহীহ বুখারীর ৫২৮ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে বলেছিলেনঃ যদি তোমাদের ঘরের পাশে একটি ঝর্ণা থাকে আর তোমরা প্রতিদিন তাতে ৫ বার গোসল কর, তাহলে তোমাদের শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি ? সাহাবারা বললেনঃ না। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ৫ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণও ঠিক এরূপ। আল্লাহ তায়ালা নামায দ্বারা যাবতীয় গোনাহ ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে দেন। সুবহানাল্লাহ !

সুধীবৃন্দ ! আসুন এবার আমরা সঠিক ভাবে নামায আদায় করা সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু'টি মাসআলা আলোচনা

করিঃ (১) নামাযের কাতার সোজা করা, (২) তা'দীলে আরকান। অর্থাৎ, শান্তভাবে রুকূ ও সাজদা তথা নামাযের রুকুন্‌গুলো আদায় করা। বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে নামাযের কাতার সোজা করা হয় না । আর বেশিরভাগ নামাযীরা রুকূ ও সাজদা সঠিক ভাবে আদায় করে না। তাই আমরা এ মাসআলা দু'টি খুব গুরুত্ব সহকারে আমল করার নিয়্যাতে লক্ষ্য করি।

প্রথম মাসআলাঃ নামাযে কাতার সোজা করার গুরুত্ব। এ সম্পর্কে প্রথমে বলে রাখি, নামাযে কাতার সোজা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। অর্থাৎ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এমনকী কিছু উলামায়ে কিরাম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। মনে রাখবেন, কাতার সোজা করলে নামাযের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আর কাতার সোজা না করলে আল্লাহ তায়ালা নামাযীদের মনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেন। একথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সহীহ বুখারীর ৭২২ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَقِيْمُوا الصَّفَّ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

" তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর। কেননা, কাতার সোজা করা হল নামাযের সৌন্দর্যতা।" সহীহ বুখারীর ৭১৭ নম্বর হাদীসে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতার সোজা করবে। তা না হলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।"

এবার প্রশ্ন হল, কাতার কীভাবে সোজা করতে হবে ? এ সম্পর্কে সুনানে আবূ দাউদের ৬৬২ নম্বর হাদীসে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রযি) কাতার সোজা করার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেনঃ

رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ

"আমি মানুষকে পাশের সাথীর কাঁধের সাথে নিজের কাঁধ, হাঁটুর সাথে হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি।"

সুনানে আবূ দাঊদের ৬৬৭ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ رَصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ

" তোমরা তোমাদের কাতারে জমে জমে একে অপরের সাথে মিলে দাঁড়াও। আর কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও ।"

এ থেকে আমরা কাতার সোজা করা সম্পর্কে দু'টি জিনিস জানতে পারলামঃ (১) নামাযের কাতারে কাঁধ, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি, এই তিনটি অঙ্গ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। মিলিয়ে দাঁড়ানো মানে, এই তিনটি অঙ্গ একে অপরের সোজা রাখা। (২) একে অপরের সাথে মিলে জমে দাঁড়াতে হবে। যার ব্যাখ্যা ফুকাহায়ে কিরামগণ এভাবে দিয়েছেন যে, কাতারে খালি জায়গা পূর্ণ করে এমন ভাবে মিলে দাঁড়াতে হবে, যেন মাঝে আর একজন না দাঁড়াতে পারে। আমরা বেশিরভাগ মসজিদে এভাবে গুরুত্ব সহকারে কাতার সোজা করতে দেখি না। তাই মাসআলাটি খুব খেয়াল রাখতে হবে।

ইমাম তিরমিযী (রহ) সুনানে তিরমিযীর ২২৭ নম্বর হাদীসের অধীনে লিখেছেন- "হযরত উমার (রযি) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি (নিজের খিলাফত আমলে) নামাযের কাতার ঠিক করার জন্য কিছু মানুষ নিযুক্ত করে রাখতেন। তাঁকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জানানো হত যে, কাতার সোজা হয়ে গেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করতেন না। আর হযরত উসমান ও আলী (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) কাতার সোজা করার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন এবং তাঁরা (মুসল্লায় দাঁড়িয়ে নামায শুরু করার আগে) বলতেনঃ তোমরা

সোজা হও। আর আলী (রযি) তো নাম ধরে বলতেন, অমুক একটু আগাও, অমুক একটু পিছাও।"

ভাই সকল ! আমরা নামায সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু'টি মাসআলা আলোচনা করছিলাম। এ পর্যন্ত আমরা কাতার সোজা করার গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার দ্বিতীয় মাসআলা হল, তা'দীলে আরকান। এখানে 'আরকান' বলতে, নামাযের ভিতরের ৪টি বিশেষ আমলঃ (১) রুকূ, (২) সাজদা, (৩) কওমা। অর্থাৎ, রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, (৪) জালসা। অর্থাৎ, দুই সাজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা। এই ৪ টি আমল ধীরস্থির ও শান্ত ভাবে আদায় করাকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তাদীলে আরকান' বলা হয়।

মনে রাখবেন, নামাযের মধ্যে তা'দীলে আরকান পালন করা ওয়াজিব। রুকূতে ও রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে এবং সাজদায় ও দু'সাজদার মাঝে বসে, শরীরের সব অঙ্গগুলি নিজ নিজ জায়গায় রেখে, শান্তভাবে কমপক্ষে একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলার সময় পরিমাণ অপেক্ষা করতে হবে। এরই নাম হল তা'দীলে আরকান পালন করা।

আল্লামা শামী (রহ) ফাতাওয়া শামীর ১ম খণ্ডে ৪৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে তা'দীলে আরকান না করে, তাহলে নামায পুনরায় দোহরাতে হবে। আর যদি কেউ ভুল করে এমন করে, তাহলে সাজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব হবে।

মুসল্লী ভায়েরা ! তা'দীলে আরকান সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে রাখবেন। সহীহ বুখারীর ৭৫৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার খল্লাদ বিন রাফে নামক এক সাহাবী মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে তড়িঘড়ি করে তা'দীলে আরকান না করে নামায আদায় করেছিলেন। নামায শেষ করে তিনি যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে সালাম দিলেন, তখন নবীজি তাকে বললেনঃ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "তুমি ফিরে যাও, তোমার

নামায হয় নি।" তিনি ফিরে গিয়ে আবার ঠিক সেই রকম তড়িঘড়ি করে তা'দীলে আরকান না করে নামায আদায় করেছিলেন। নবী সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আবার ফেরত পাঠালেন। এভাবে তৃতীয় বারের পর সাহাবী বলেছিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি এর চেয়ে বেশি ভাল নামায পড়তে জানি না। কীভাবে পড়তে হবে আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা'দীলে আরকান সহ নামায পড়া শিক্ষা দিয়েছিলেন।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে ৫ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে জামাআতের সাথে সুন্নত তরীকায় আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন। وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

বয়ান নম্বর ২৭

সূরা আস্‌রের তাফসীর

জুমাদাল উলার প্রথম জুমুআর বয়ান

৫ জুমাদাল উলা ১৪৪৩ হিজরী, ১০ ডিসেম্বর ২০২১

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ **وَالْعَصْرِ ❁ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ❁ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ❁** صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ আমরা কুরআন মজীদের ৩০ পারার সূরা আস্‌রের সংক্ষিপ্ত তাফসীর করব,

ইনশা আল্লাহ। এটা কুরআনের ১০৩ নম্বর সূরা। আমরা সর্বপ্রথম সূরাটির তরজমা লক্ষ্য করি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "আস্‌রের নামাযের কসম।" কিংবা وَالْعَصْرِ মানে "যামানার কসম। নিশ্চয় সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে হকের আদেশ করেছে ও সবর করার নির্দেশ দিয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়।" এটা হল সূরা আস্‌রের তরজমা।

তিনটি আয়াত বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত এই সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা গোটা মানব জাতির ব্যর্থতা ও সফলতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বিশ্ববরেণ্য ইমাম শাফিয়ী (রহ) বলেছেনঃ মানুষেরা যদি কেবল এই সূরাটি পড়ে আমল করে নেয়, তবে তাদের ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা এই সূরার কথাগুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য শুরুতে আস্‌রের নামাযের কসম খেয়েছেন। এজন্যই এই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা আস্‌র। অনুরূপ ভাবে, কুরআন মজীদের ৮৯ নম্বর সূরার নাম হল, সূরা ফজর। ওই সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তায়ালা ফজরের নামাযের কসম খেয়েছেন। মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা ৫ওয়াক্ত নামাযের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ফজর ও আস্‌রের নামাযের কসম খেয়েছেন। বাদবাকি ৩ ওয়াক্ত নামাযের কসম খান নি। এর কারণ হল, ফজর ও আস্‌রের নামাযের এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোন নামাযের নেই। (১) জামাআতের সাথে এই দু'টি নামায আদায় করা মানে ফেরেশতাদের সাথে নামায পড়া। (২) যারা এই দু'টি নামাযের পাবন্দি করবে, পরকালে তাদের আল্লাহর দীদার নসীব হবে। এই দু'টি ফযীলতের কারণে আল্লাহ তায়ালা ফজর ও আস্‌রের নামাযের কসম খেয়েছেন।

অন্য এক ব্যাখ্যা মতে وَالْعَصْرِ মানে, যামানার কসম। এখানে আল্লাহ তায়ালা যামানার কসম করে বলেছেনঃ নিশ্চয়

সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তবে যাদের মধ্যে ৪টি গুণ আছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। সেই গুণগুলি হলঃ (১) ঈমান আনা, (২) সৎকাজ করা, (৩) অন্যকে হকের কথা বলা, (৪) অপরকে সবর ও ধৈর্য ধারণ করতে বলা।

সূরার শুরুতে যামানার কসম খাওয়ার কারণ এই যে, যামানা আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে একটি মস্তবড় নিয়ামত। যামানা মানে, সময়। অর্থাৎ মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছর। এই সময়ই হল মানুষের জীবনের মূল পূঁজি। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত মানুষের মহা মূল্যবান সম্পদ। আরাবীতে একটি প্রবাদ আছেঃ اَلْوَقْتُ اَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ "সময় সোনার চেয়ে দামী।" আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরার শুরুতে সময়ের কসম খেয়ে বলতে চেয়েছেন, যে সমস্ত মানুষেরা এই ৪টি কাজে সময় ব্যয় করবে, তারা সফলকাম। আর যারা এই ৪টি কাজ ছাড়া অন্য কাজে সময় ব্যয় করবে, তারা নিজেদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করবে।

ইমাম রাযী (রহ) তাফসীরে কবীরের মধ্যে লিখেছেন, এক আল্লাহ ওয়ালা বলেছেনঃ আমি একজন বরফ বিক্রেতার কাছ থেকে সূরা আস্‌রের ব্যাখ্যা শিখেছি। আমি দেখলাম, সে চিৎকার করে বলছেঃ ভাইসকল ! তোমরা এমন এক ব্যক্তির প্রতি দয়া কর, যার ব্যবসার মূলপুঁজি গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভাইসকল ! তোমরা এমন এক ব্যক্তির প্রতি দয়া কর, যার ব্যবসার মূলপুঁজি গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, তোমরা আমার বরফগুলো কিনে নাও। কেননা, এই বরফগুলোই আমার মূলধন। যদি তোমরা এগুলো না কেন, তবে তা গলে শেষ হয়ে যাবে আর আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।

আল্লাহ ওয়ালা লোকটি বললেনঃ আমি তখন আল্লাহ তায়ালার বাণী-"যামানার কসম ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত" এই কথাটির অর্থ খুব ভাল বুঝতে পারলাম। আমি বুঝলাম, আমাদের

জীবন এই লোকটির বরফের মতো গলে যাচ্ছে। বরফ ওয়ালা যদি সময় মতো বরফ বিক্রি করতে পারে, তবে সে লাভবান হবে। আর যদি বিক্রি করতে না পারে, তবে বরফ গলে তার পুঁজি নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনুরূপভাবে, আমাদের জীবনের সময়গুলো আমাদের অমূল্য সম্পদ। আমরা যদি সময় সঠিক কাজে ব্যয় করি, তবে আমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা হাসিল করতে পারব। আর যদি সময় ভাল কাজে না লাগাই, তাহলে সময় বরফের মতো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা ইহকাল ও পরকালে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হব।

ভাই সকল ! সূরা আস্‌রে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ যারা ৪ রকম আমলে সময় ব্যয় করে, তারা হল কামিয়াব। প্রথম আমলঃ ঈমান আনা। দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবির প্রথম শর্ত হল ঈমান। ঈমান সেই অমূল্য সম্পদ, যা নবী নূহ আলাইহিস সালাম নিজের ছেলে কেনানের জন্য চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের পিতা 'আযর'-এর জন্য চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। নবী লূত আলাইহিস সালাম নিজের স্ত্রীর জন্য চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। নবী রহমাতুল্লিল আলামীন নিজের চাচা আবূ তালিবের জন্য চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সেই ঈমানের সম্পদ দান করেছেন। সকলে বলি, আলহামদুলিল্লাহ !

সহীহ বুখারীর ৪৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবী আনাস (রযি) বলেছেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলবে আর তার অন্তরে এক অণু পরিমাণে ঈমান থাকবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এদ্বারা বোঝা যায়, ঈমানের বিনিময়ে মিলবে জান্নাত। অতএব, আমাদের প্রত্যেকের প্রথম কাজ হবে ঈমান আনা।

দ্বিতীয় আমলঃ সৎকাজ করা। মনে রাখতে হবে, আমরা যখন বিশ্বাস করলাম যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই আমাদের ও সর্বজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের সমস্ত নিয়ামত তাঁরই দান, তখন স্বাভাবিক ভাবে তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, আমাদের উপর জরুরী হয়ে যায়। আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নাম হল সৎকাজ করা। একেই বলে ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা সূরা যারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
" আমি মানুষ ও জিন সম্প্রদায়কে আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" আর সূরা কাহ্‌ফের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
"পৃথিবীতে যা আছে, সব কিছুকে আমি পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্যে সৃষ্টি করেছি। যাতে মানুষদেরকে পরীক্ষা করতে পারি, তাদের মধ্যে কারা ভালকাজ করে।"

সুধীবৃন্দ ! আমাদের কর্তব্য বেশি বেশি নেক আমল করা। কোন নেক আমলকে মামুলি মনে না করা। কেননা, হতে পারে যে আমলটিকে আমরা ছোট মনে করছি, সেই আমলের ওসিলায় আমরা আল্লাহর কাছে মুক্তি পেয়ে যাব। যেমন, সহীহ বুখারীর ৬৫২ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) সূত্রে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটার ডাল দেখতে পেয়ে সেটাকে সরিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তার এ আমলটিকে কবূল করে তার জীবনের গোনাহ সমূহকে মাফ করে দিয়েছিলেন। এদ্বারা বোঝা যায়, কোন নেক আমলকে তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দেওয়া যাবে না ।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! আমরা আলোচনা করছিলাম, সূরা আস্‌রের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজের কামিয়াব বান্দাদেরকে ৪টি আমল করতে বলেছেনঃ (১) ঈমান আনা,

(২) নেক আমল করা। আমরা এ পর্যন্ত এ দু'টি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

তৃতীয় আমলঃ অপরকে হকের কথা বলা। অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ করা। চতুর্থ আমলঃ অপরকে (গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য) সবর করতে বলা। অর্থাৎ মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।

বোঝা গেল, ঈমান আনার পর কেবল নিজে আমল করাটা যথেষ্ট নয়। বরং অন্যকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে। যেহেতু আমরা শেষ নবীর উম্মত, তাই বিশেষ করে আমাদের জন্য অপরকে ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাটাও ফরয। এজন্যই সূরা আল ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।"

শ্রোতামণ্ডলী ! মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা এই উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য। কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় আমাদেরকে এর আদেশ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের ৮১ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ মূসা আশয়ারী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন খারাপ কাজ হতে দেখবে, সে যেন হাত দ্বারা সেটাকে প্রতিরোধ করে। যদি হাত

দ্বারা প্রতিরোধ করতে না পারে, তবে যবান দ্বারা তার প্রতিবাদ করবে। যদি এও না পারে, তবে অন্তর দ্বারা সেটাকে খারাপ মনে করবে। আর এটা ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা।"

মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর বুকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় কাজ চিরদিন থেকে হয়ে আসছে। আগামীতেও হতে থাকবে। যদি আদেশ-নিষেধের কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সমাজের মধ্যে ব্যাপক ভাবে অন্যায় অত্যাচার এবং বিভিন্ন রকম পাপ কাজ একের পর এক বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ফলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে না। তাই সুস্থ ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলতে হলে, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা অত্যন্ত জরুরী। এজন্যই কুরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মানুষের উপর তার ক্ষমতা অনুযায়ী এটা ফরয করা হয়েছে। অবৈধ কাজ করা যেমন পাপ, তেমনি কাউকে অবৈধ কাজ করতে দেখে তাকে বাধা না দেওয়াটাও পাপ। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে উদাসীন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সাবধান করে বলেছেনঃ "সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাক। তা নাহলে অতিসত্বরে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর আযাব পাঠিয়ে দেবেন। তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ করলেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুআ কবূল করবেন না।" এটা সাহাবী হুযাইফা (রযি) হতে বর্ণিত সুনানে তিরমিযীর ২১৬৯ নম্বর হাদীস। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

জামিয়া নু'মানিয়া

জামিয়া নু'মানিয়া ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবিত রহিমাহুল্লাহর স্মৃতি-প্রতিষ্ঠান। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থানার অন্তর্গত ফতোরআটি গ্রামে এটি অবস্থিত। হিরা গুহা থেকে কুরআন ও সুন্নাহর যে নূর মক্কা-মদীনা হয়ে কূফা থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই হিরার আলো যুগোপযোগী পন্থায় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই জামিয়া নু'মানিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান এ প্রতিষ্ঠানে ৫টি বিভাগ রয়েছেঃ (১) তা'লীম বিভাগ, (২) প্রকাশনী বিভাগ, (৩) মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ, (৪) মিডিয়া বিভাগ, (৫) হিলাল কমিটি।

তা'লীম বিভাগে মক্তব, নাযেরা ও হিফ্যের পড়াশোনা চলছে। প্রকাশনী বিভাগ থেকে এ বছর দু'জন লেখকের দু'টি কিতাব ছাপিয়ে ফ্রি বন্টন করা হয়েছে। মিম্বার ও মিহরাব বিভাগে প্রায় ৬ হাজার ইমাম সদস্য আছেন। মিডিয়া বিভাগ থেকে আবে হায়াত মিডিয়ার খিদমত আপনাদের জানা আছে। আগামী রমাযানের পর উর্দূ ভাষায় আর একটি ইউটিউব চ্যানেল চালু হবে, ইনশা আল্লাহ। আর হিলাল কমিটির মাধ্যমে প্রত্যেক আরবী মাসের ২৯ তারিখে আপনারা চাঁদের সংবাদ তো পেয়েই থাকেন।

এ শিশু প্রতিষ্ঠান আপনাকে বন্ধুরূপে পাশে পেতে চায়।

বিনীত,

আপনাদের মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(জুমাদাল উখরা ১৪৪৩ হিজরী, জানুয়ারী ২০২২)

যোগাযোগ নং- ৯৭৩২৫৭২৫২৪

বয়ান নম্বর ১৮

অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা

রবীউল আওয়ালের প্রথম জুমুআর বয়ান

(১লা রবীউল আওয়াল ১৪৪৩ হিজরী, ৮ অক্টোবর ২০২১)

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হল, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। আসলে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করাটা নবীদের কাজ। আমরা উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সেই নবী ওয়ালা কাজের দায়িত্ব পেয়েছি বলেই আমরা হয়েছি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

"তোমরা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে।"

সুধীবৃন্দ ! প্রথমে জানা দরকার যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সহীহ মুসলিমের ৮১ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রাত। উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ রমাযান মাসের পর সবচেয়ে বেশি ফযীলতপূর্ণ দিন হল, যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের বিশেষ তিনটি আমল আছে। (১) এ দশ দিনে বেশি বেশি নেক আমল করা। সহীহ বুখারীর ৯৬৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনেরই আমল উত্তম নয়। অতএব, আমাদের একান্ত কর্তব্য, বিশেষ করে এই দশ দিন তাসবীহ, তিলাওয়াত, যিক্‌র-আযকার, নামায, রোযা প্রভৃতি সব রকম ইবাদত যথাসাধ্য বেশি পরিমাণে করতে থাকা।

(২) ইয়াওমে আরাফা'র রোযা রাখা। যুল হিজ্জাহ মাসের ৯ তারিখকে ইয়াওমে আরাফাহ বলা হয়। এ দিন রোযা রাখার ফযীলত অপরিসীম। সহীহ মুসলিমের ১১৬২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ

"আমি আল্লাহর কাছে আশারাখি যে, ইয়াওমে আরাফা'র রোযার বিনিময়ে পূর্বের এক বছর ও আগামী এক বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।"

(৩) যারা কুরবানী করবেন, তাদের জন্য যুল হিজ্জাহ মাসের শুরু ১০ দিনে একটি মুস্তাহাব আমল আছে। সেটা হল, কুরবানী দাতাগণ এ দশ দিন নিজেদের চুল ও নখ কাটবেন না। সহীহ মুসলিমের ৫০১৫ নাম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যার কাছে কুরবানীর পশু আছে, সে যেন যুল হিজ্জাহ মাসের নতুন চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানীর পশু যবাই করা পর্যন্ত নিজের চুল ও নখ না কাটে।

সুধীবৃন্দ ! আজ মুসলিম সমাজের বহু মানুষ এমন আছে, যারা জোর পূর্বক পরের জমি ভোগ দখল করছে। অবৈধ ভাবে আদালতে বছরের পর বছর ধরে মামলা লড়ছে। মামলায় জয়ী হওয়ার জন্য মোটা অংকের ঘুষ দিচ্ছে। উকিলের পিছনে বহু টাকা-পয়সা লুটিয়ে দিচ্ছে। অনুরূপ ভাবে, আমরা অনেকে এমন আছি, যারা নিজের বোনদেরকে মা-বাপের জমি-জায়গার অংশ দিই না। মনে রাখবেন, এসব কিছু হারাম ও গোনাহে কবীরাহ। যে ব্যক্তি জমির আসল মালিক নয়, যদি আদালতের ফয়সালা তার স্বপক্ষেও হয়, তবুও সেই জমি তার জন্য বৈধ হবে না। বরং সেটা হবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন। সহীহ বুখারীর ২৬৮০ নম্বর হাদীসে এ কথা বর্ণিত আছে।

ভাই সকল ! আমাদের উপর ফরয হল, এ সব হারাম পন্থা অবলম্বন না করে হালাল উপায়ে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করা। কেননা, আমাদের ভাগ্যে যে পরিমাণ রুযি আল্লাহ রেখেছেন, যে পন্থা আমরা অবলম্বন করি না কেন, তার চেয়ে এক বিন্দু বেশি আমরা হাসিল করতে পারব না। মুস্তাদ্‌রাক হাকিমের ২১৩৬ নম্বর হাদীসে ইবনে মাসঊদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার অন্তরে একথা দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ তার বরাদ্দ রুযি ভোগ না করা পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে না। সুতরাং হে লোক সকল ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় রুযি সন্ধান কর। যদি রুযি হাসিল হতে বিলম্ব মনে হয়, তবুও যেন কেউ আল্লাহর নাফরমানী করে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা না করে। কেননা, আল্লাহর নাফরমানী করে রুযি হাসিল করা যায় না।"

উত্তম পন্থায় আয়-রোজগারের মধ্যে ব্যবসা হল শ্রেষ্ঠপন্থা। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। সুনানে তিরমিযীর ২১৩৯ নম্বর হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী